কাজললতা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কল্যাণীয় শ্রীমান বাসব সেন

স্নেহাস্পদেষু

—আশীর্বাদক বাবা

উল্কা

২৬এ গড়িয়াহাট রোড

কলিকাতা ১৯

॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তের অন্যান্য বই ॥

অস্তি ভাগীরথী তীরে
তালপাতার পুঁথি
কৃষ্ণকলি নাম তার
ময়ূরপঙ্খী নাও
হীরা চুনি পান্না
আলোকলতা
রতিবিলাপ
রাতের পাখী
বেলাভূমি
নিশিপদ্ম
মধুমিতা
বাদশা
মল্লার
বধূ
ঝড়
শর্বরী
স্বর্ণরেণু
মৃত্যুবাণ
কালনাগ
বহ্নিশিখা
রাত্রি শেষ
হাসপাতাল
কিরীটী রায়
উত্তর ফাল্গুনী
হাড়ের পাশা
ধূসর গোধূলি
সকলি গরল ভেল
বকুলগন্ধে বন্যা এলো

কিরীটী অমনিবাস
লালুভুলু
কলঙ্ককথা
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি
সূর্যতপস্যা
নিরালা প্রহর
রাত্রি-নিশীথে
রূপ ও প্রসাধন
কন্যা কেশবতী
কনকপ্রদীপ
কাগজের ফুল
কন্যা কুমারী
শঙ্খবলয়

কালো ভ্রমর (১ম—২য়)
ঐ (৩য়—৪র্থ)
বিদ্রোহী ভারত
ইমন কল্যাণ
রুক্মিণী বাঈ
কালো হাত
ময়ূর মহল
রাণী বিলঃ
মায়ামৃগ
ছিন্নপত্র
মুখোশ
অরণ্য
চক্র
উল্কা
নূপুর
শ্রাবণী
কাচঘর
বিষকুম্ভ
ঘুম নেই
নীল তারা
অপারেশন
পিয়া মুখ চন্দা
বহুত মিনতি
সেই মরুপ্রান্তে
গড় মান্দারণ
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী
রাতের রজনীগন্ধা
পোড়াবাটি ভাঙাঘর

কাজললতা

॥ ১ ॥

শীতের মধ্য রাত্রি

কুয়াশার একটা পর্দা যেন ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে শীতের মধ্য রাত্রির স্তব্ধতায় থির থির করে কাঁপছিল।

দু-তিন হাত দূরে ভাল করে স্পষ্ট ভাবে যেন কিছু চোখে পড়ে না, তবু সেই ঝাপ্‌সা কুয়াশার ভিতর দিয়েই হন হন করে হেঁটে চলেছিল একেবারে নির্জন রাস্তাটা ধরে মল্লিকা। পরনে তখনো কত সাধ করে পরা দামী সোনালী কাজ করা রাঙা টুক্‌টুকে বেনারসী শাড়ীটা।

এক গা ভর্তি গহনা।

চুড়ি বালা, কঙ্কণ চুড়, তাগা মানতাসা, সিঁথিমৌর—গহনার বাক্সটা থেকে একটা একটা করে বেছে নিয়ে একা একা ঘরের মধ্যে বিরাট সেই আর্শিটার সামনে দাঁড়িয়ে সে পরেছিল গহনাগুলো।

প্রত্যাশিত একটি মুহূর্তের জন্য—বিশেষ মানুষটির সেই রাত্রে আবির্ভাবের কথা ভেবে ভেবে নিজেকে সে সাজিয়েছিল আর মনে মনে পুলকের এক অপূর্ব শিহরণ বোধ করেছিল ক্ষণে ক্ষণে।

কেউ সাজায় নি তাকে—কেউ সাজিয়ে দেয় নি—কেউ জানতও না যে অমন করে ঘরের খিল তুলে দিয়ে সে আপনাকে সাজিয়েছে।

কেউ বলেও নি তাকে সাজবার কথা।

ঘরের মধ্যে একা একা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনের মধ্যে তার খেয়ালটা জেগেছিল। দ্বিপ্রহরে শাশুড়ি ভবানী দেবী তাকে ঐ ঘরের মধ্যে ডেকে এনে প্রথমে বলেছিলেন, এই তোমার ঘর বৌমা—

তারপর ঘরের মধ্যে বিরাট আলমারিটার সামনে নিয়ে গিয়ে আঁচলের চাবির গোছার একটি চাবির সাহায্যে আলমারিটা ওর চোখের সামনে ভবানী দেবী খুলে দিয়েছিলেন। থরে থরে সব দামী দামী রংবেরঙের শাড়ি।

বেনারসী, সিল্ক-সিফন-তসর-জর্জেট-চিকন কত শাড়ি যে তার ইয়ত্তা নেই।

তুমি একদিন আসবে—এ বাড়িতে এসে পরবে তাই এই সব আমি তোমার জন্য কিনে রেখেছি বৌমা।

গতরাত্রে বিয়ের সময়কার তার সাজসজ্জা যা তার মনের মধ্যে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল—একটা বেদনার আবর্ত রচনা করেছিল সেটা যেন মুহূর্তে কোথায় মিলিয়ে যায়।

বিয়ের রাত্রে কোন বেশভূষা ছিল না তার।

না কোন ভাল শাড়ি না কোন গহনা। না—সানাই না—আলো না কিছু—যেন কোন উৎসবই না। সামান্য একটা লাল পাড় শাড়ি, এক গাছি করে সোনার বালা—লাল শাঁখা আর কপালে সামান্য চন্দনতিলক।

ভবানী দেবী তার বাবা মহেন্দ্রনাথকে আগেই কড়ার করিয়ে নিয়েছিলেন—কোন উৎসব, কোন জাঁকজমক কিছুই হবে না বিবাহের রাত্রে।

কোন মতে বিবাহের অনুষ্ঠানটুকু সম্পন্ন করা হবে মাত্র।

কন্যা-সম্প্রদান—মন্ত্রপাঠ—অগ্নি নারায়ণশিলা সাক্ষী রেখে।

এবং কন্যাকে তুলে এনে বিবাহ দিতে হবে।

ভবানী দেবী বলছিলেন, রায় বংশের ঐ নিয়ম। বিবাহ অনুষ্ঠান যৎসামান্য ভাবে—সত্যিকারের জাঁকজমক—উৎসব সব তিনি করবেন পাকস্পর্শের দিন—

তার আত্মীয়-স্বজনরা আসবে—উৎসব যা কিছু লৌকিকতা তখনই হবে।

মহেন্দ্রনাথও সম্মত হয়েছিলেন।

মল্লিকা যে জানত না তাও নয়।

আড়াল থেকে সবই সে শুনেছিল।

সুবে তখন কলেজ থেকে ফিরে এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে

উঠতে ঘটকের কথাগুলো তার কানে গিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ডান দিকে দোতলায় বাবার বসবার ঘরটা।

বাবার দিন ও রাত্রির বেশীর ভাগ সময়ই ঐ ঘরেই কাটত।

মেঝেতে শতরঞ্চি বিছানো। কয়েকটা ছোট বড় তাকিয়া।

বাবার কোলের কাছে তানপুরাটা ও একপাশে অল্প দূরে বাঁয়া তবলাটা পড়ে আছে।

পাশে দাঁড়িয়ে রজনী কাকা।

বাবার একটা হাত তানপুরার উপরে, মধ্যে মধ্যে তার দুটো আঙুল তানপুরার তার ছুঁয়ে চলেছে। সামনে বসে শিবু ঘটক হাত নেড়ে নেড়ে তার বাবার সঙ্গে কথা বলছিল, বুঝলেন চৌধুরী মশাই, যদি এ বিয়ে হয় তখন বলবেন আমাকে, হ্যাঁ একটা বিয়ের মত বিয়ে বটে। যেমন চেহারা—তেমনি চরিত্র—শিক্ষিত বাড়ির ঐ একটি মাত্র ছেলে। মুর্শিদাবাদে পৈতৃক বাড়ি ত আছেই তাছাড়া কলকাতা শহরেও খান দুই বাড়ি, আরো আছে বিরাট তেজারতি কারবার যাকে বলে রাজার ঐশ্বর্য বুঝলেন কিনা—?

বুঝলাম তো সবই সরকার মশাই, কিন্তু তারা আমার মত সামান্য একজন লোকের মেয়ের সঙ্গে কাজ করতে যাবেনই বা কেন। কত ভাল কত বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে পাবেন—

আহা বললাম তো—শিবু সরকার বলতে লাগল, ভদ্রমহিলার দাবী হচ্ছে ভদ্রবংশের একটি মেয়ে হবে, দেখতে মোটামুটি হলেই চলবে তবে হ্যাঁ, দুটি শর্ত আছে এক মেয়েটি লেখাপড়া জানা চাই এবং কোষ্ঠীর মিল হতে হবে—

কোষ্ঠীর মিল?

হ্যাঁ—নচেৎ আমিই কি কম মেয়ের সঙ্গে এ যাবৎ সম্বন্ধ এনেছি চৌধুরী মশাই কিন্তু হলো আজ পর্যন্ত, ওদের যিনি কোষ্ঠী বিচার করেন সেই বাগচী মশাই কেবলই বলেন, না যেমনটি চাই তেমনটি নয়, এখানে হতে পারে না।

কিন্তু সেদিনই তো আপনাকে বলে দিয়েছিলাম সরকার মশাই মেয়ের আমার কোন কোষ্ঠিই নেই—

বলেছিলেন ঠিকই কিন্তু ঐ যে আপনি মেয়ের জন্ম সময় ও তারিখ সন দিয়েছিলেন, বলেছিলাম না এতেই কাজ চলে যাবে, বাগচী মশাই কোষ্ঠী তৈরী করে বিচার করেছেন।

কোষ্ঠী তৈরী করে বিচার করেছেন—

তবে বলছি কি, আর তাইতেই তো তিনি বললেন এখানেই বিয়ে দাও। মেয়েটির স্বামী ভাগ্য অসাধারণ—ভাগ্যাধিপতি ভাগ্য স্থানে এবং সপ্তমে কেন্দ্রী বৃহস্পতি—বুঝলেন একেবারে রাজযোটক। তাছাড়া আপনার মেয়ের ফটো দেখেও তাঁর বেজায় পছন্দ হয়েছে। তাই তো বলছি আর কালহরণ করবেন না, চলুন—কথাবার্তা বলে পাকাপাকি করে ফেলুন—চার হাত এক করে দিন একটা শুভদিন দেখে।

তথাপি দোমনা করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ, কিন্তু শিবু সরকার শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কারণ এতদিন পরে যে সুযোগটা হাতে এসেছে, শিবু ঘটক সেটা হাতছাড়া করবে এমন বোকা সে নয়।

শিবু ঘটক এতটুকু অত্যুক্তি করেনি মহেন্দ্রনাথের কিন্তু পরে মনে হয়েছিল।

বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ি।

এককালে নামকরা জমিদার ছিল রায়েরা তারপর তেজারতি কারবার শুরু করে—ঘরে তাদের সত্যিই লক্ষ্মীর আশীর্বাদ যেন অফুরন্ত ঝরে পড়ছে।

একটি মাত্র ছেলে ঐ অসিত ভবানী দেবীর।

দেখতে শুনতে চমৎকার। ধীর শান্ত বিনয়ী।

এগার বছরের ঐ ছেলেকে নিয়ে ভবানী দেবী বিধবা হয়েছিলেন।

ভবানী দেবী বললেন, বাগচী মশাই বলেছেন এ বিবাহ হলে সর্বতোভাবে মঙ্গলই হবে।

মেয়ে তো একটিবার আপনি দেখলেনও না, মহেন্দ্রনাথ বলেন।

না—শিবুর মুখেই তো শুনেছি, তাছাড়া রূপের প্রতি তেমন আমার বা আমার ছেলের কোন আকর্ষণ নেই। একটি মোটামুটি সুশ্রী দেখতে ভদ্রবংশের শান্ত প্রকৃতির লেখাপড়া জানা মেয়ে চাই।

তা যদি বলেন রায় গিন্নী, মেয়ে আমার নিজের বলে বলছি না, সত্যিই দেখবেন সে আপনার কোন রকম দুঃখের কারণ হবে না।

ঐটুকুই তো চাই আমি চৌধুরী মশাই। ছেলে আমার আজ-কালকার মত নয় একটু চাপা ও ধীর প্রকৃতির—তাহলে একটা দিন ঠিক করে ফেলা যাক কি বলেন?

বেশ—আপনার যেমন ইচ্ছা—

তবে একটা শর্ত আছে আমার শিবু নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে।

হ্যাঁ—

আপনার তাতে আপত্তি নেই তো?

না। তবে—

আপনি হয়ত উৎসবের কথাটা ভাবছেন—কিন্তু কথাটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি—একবার বিয়ের রাত্রে বংশে একটা দুর্ঘটনা ঘটে, বাজীর আগুন হঠাৎ বধূর পরিধেয় বস্ত্রে ধরে গিয়ে মেয়েটি সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধ হয়—যার ফলে তার মৃত্যু হয়—সেই হতেই বিয়ের রাত্রে সমস্ত উৎসব বাদ দিয়ে পরে উৎসব করা হয়ে থাকে পাকস্পর্শের দিন এবং পাকস্পর্শ হয় ফুলশয্যার পরের রাত্রে।

না, না—তেমন যদি কিছু থাকে তবে নাই বা হলো উৎসব। হাজার হোক হিন্দু আমরা, সংস্কারকে বাদ দিয়ে চলবোই বা কেন।

বিবাহের দিন ঠিক করে মহেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন সত্যি কথা বলতে কি হৃষ্ট চিত্তেই। মেয়েকেও কথাটা বললেন।

মল্লিকা বলেছিল, আমি কি বলবো বাবা, তুমি যা ভাল বুঝবে করবে।

তবে মহেন্দ্রনাথ অসিতের একটা ফটো এনেছিলেন—রজনীর হাত দিয়ে ফটোটা মেয়েকে দেখবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

মল্লিকার কি অসিতের ফটোটা দেখে ভাল লাগেনি?

লেগেছিল বৈকি।

শান্ত সুন্দর সৌম্য চেহারা।

বুদ্ধিতে উজ্জ্বল দুটি চোখের দৃষ্টি। প্রশস্ত কপাল।

দেখবো না দেখবো না করেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মল্লিকা দেখেছিল বারে বারে অসিতের ফটোটা এবং অসিতকে চোখে না দেখলেও ফটোতেই যেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

তবু মনটা যেন মল্লিকার কেমন খুঁতখুঁত করেছিল।

সেই কোন্ শিশুকাল থেকে মেয়ে হয়ে জীবনে বিয়ের রাত্রের যে মধুর স্বপ্নটা মনের মধ্যে স্বপ্নের জাল বুনেছে সেই স্বপ্নটাই যখন সামান্য আলোয় অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল মনটা সত্যিই তার কেমন একটা ক্ষোভে যেন ভরে গিয়েছিল।

এ কেমন বিয়ে।

এতবড় লোকের একমাত্র ছেলের বিয়ে—উৎসবের জাঁকজমক না হয় নাই রইলো, তাই বলে এমনি করে কোন মতে কাজ সারা।

বিরাট আঙ্গিনা জুড়ে একটি মাত্র বাতি জ্বলছে—ইলেকট্রিক বাল্ব তাও কম পাওয়ারের। কয়েকটি বর্ষীয়সী নারী—রায়েদের ব্যবসার ম্যানেজার প্রৌঢ় মনোরঞ্জনবাবু, ভবানী দেবী—তার ভ্রাতুষ্পুত্রী মায়া, পুরাতন ভৃত্য করালীচরণ—মহেন্দ্রনাথ আর পুরোহিত উভয় পক্ষের। আর বাইরের কেউ নেই।

একটি সানাইয়ের পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই।

রায়েদের বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ির অল্প দূরেই আর একটা বাড়িতে —মহেন্দ্রনাথের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন ভবানী দেবী।

পাল্কীতে করে পাত্রীকে নিয়ে এসে তোলা হয়েছিল একেবারে রায়েদের আঙ্গিনায়—উলুধ্বনি—আর শঙ্খধ্বনি।

মুখের উপরে একটা পাতলা রেশমী 'ভেল'—সবই দেখতে পাচ্ছিল মল্লিকা। তারপর বিবাহের অনুষ্ঠান—মালাবদল।

মন্ত্রপাঠ—মন্ত্রোচ্চারণ। কুশণ্ডিকা।

হোম। লাজবর্ষণ।

অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

তারপর বাসরঘর।

কিন্তু বাসরঘরে সোহাগপ্রদীপের আলোয় স্বামীর সুন্দর সৌম্য চন্দনচর্চিত ললাট ও মুখখানির দিকে চেয়ে যেন মল্লিকার মনের সব ক্ষোভ কোথায় উবে যায়।

হাতের সোনার কাজললতাটি দিয়ে অসিত মল্লিকার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, জান, এ সোনার কাজললতা দিয়েই আমার প্রপিতামহ প্রপিতামহীর সিঁথিতে—পিতামহ পিতামহীর ও বাবা আমার মায়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছেন বাসর ঘরে।

মল্লিকা লজ্জায় মাথাটা নীচু করেছিল।

তোমার নাম মল্লিকা, তাই না?

স্বামীর কণ্ঠস্বরে মুখ তুলে তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নিয়েছিল মল্লিকা।

অসিতের বোধ হয় ঘুম পাচ্ছিল।

চোখের পাতাদুটি ভারি হয়ে আসছিল।

তোমার নিশ্চয় ঘুম পাচ্ছে। মল্লিকাও শুধিয়েছিল।

ঘুম—

হ্যাঁ—শোও না—

অসিতকে আর দ্বিতীয় কথা বলতে হয় নি। সে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

কিন্তু মল্লিকার চোখে কেন যেন ঘুম আসেনি।

কতটুকুই বা আর রাত ছিল তখন।

খোলা জানালা পথে বাইরে নজর পড়ে। রাতের আকাশটা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে।

মল্লিকা ফিরে তাকায়।

অসিত তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

॥ ২ ॥

ভোর হলো।

মায়া এসে তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। অসিত তখনও ঘুমোচ্ছে।

ভবানী দেবীর ঘর সেটা।

ভবানী দেবী বোধ হয় মাত্র কিছুক্ষণ আগে স্নান করেছেন। পরনে সাদা দুধ গরদের থান।

মাথায় স্বল্প ঘোমটা।

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে কয়েকগাছি ভিজে চুল কপালের দু'পাশ দিয়ে এসে নেমেছে।

এসো মা—বোসো—

ভবানী দেবীর গা থেকে চন্দন ও ধূপের গন্ধ বেরুচ্ছে।

মায়ার দিকে ফিরে বললেন ভবানী দেবী, মায়া—করালীকে গিয়ে বল—সে সরকার মশাইকে গিয়ে বলুন—প্রথম ট্রেনেই যেন তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখানে যা অর্ডার দেওয়া হয়েছে সব যেন ঠিক মত এসে পৌঁছায়—কাল বাদে পরশু বৌভাত—পাকস্পর্শ—কাল থেকেই সব লোকজন আসতে শুরু করবে।

মায়া চলে গেল।

মল্লিকার দিকে আবার ফিরে তাকালেন, জান মা অনেকখানি আশা করে তোমাকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছি—

মল্লিকা লজ্জায় মাথাটা নিচু করে।

তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি মা—আমার আশা মিথ্যে হবে না। আমার ঐ একমাত্র ছেলে—এতদিন ওকে আমি আগলে আগলে বেড়িয়েছি—ও যেমন আমায় ছাড়া আর কিছু জানে না, তেমনি আমারও ও ছাড়া সংসারে আর কোন আশা-আকাজ্ক্ষা বা বন্ধন নেই—সেই অসিতকে কাল তোমারই হাতে আমি তুলে দিয়েছি মা। আর এও আমি জানি, যোগ্য হাতেই ওকে আমি তুলে দিয়েছি।

মায়া ঐ সময় এসে আবার ঘরে ঢুকল।

মায়া—

কেন পিসিমা?

ওকে নিয়ে যা—স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দে—

এসো ভাই—

মায়া মল্লিকার হাত ধরে এবার ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

ভবানী দেবী পুত্রবধূর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

স্নানের পর কিছু জলখাবার খাইয়ে ভবানী দেবী মল্লিকাকে নিয়ে তার ঘরে গিয়ে ঢুকছিলেন।

বলেছিলেন, ঐ তোমার ঘর মা—

তারপর একে একে আলমারী খুলে সব শাড়ি ও গহনা দেখান।

ভবানী দেবী মল্লিকাকে একাই ঘরের মধ্যে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে যান অতঃপর। মল্লিকা একা ঘরের মধ্যে থাকে।

বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ি। কত যে এর ঘর কে জানে। কাল রাত্রে যে আঙ্গিনায় চাঁদোয়া খাটিয়ে ওদের বিবাহ হয়েছিল সে আঙ্গিনাটাই বা কি বিরাট।

কিন্তু কি অদ্ভুত নিঝুম বাড়িটা।

কোন সাড়া শব্দই যেন নেই।

একা একা মল্লিকা ঘরের মধ্যে বসে থাকে আর বসে থাকতে থাকতে যেন হাঁপিয়ে উঠতে থাকে কেমন।

দুপুরে মায়া এসে মল্লিকাকে ঐ ঘরেই খাইয়ে যায়।

বিরাট রূপার থালায় ও রূপার বাটিতে বাটিতে ভাত ও নানা ব্যঞ্জন, কিন্তু মল্লিকার যেন কিছুই ভাল লাগে না।

মুখে যেন কোন কিছুতেই স্বাদ পায় না।

দুপুরের দিকে ভবানী দেবী ও মায়ার সঙ্গে দু-একজন মহিলা নতুন বউ দেখতে আসে।

আবার চলেও যায়।

দুপুর শেষ হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এক সময়। মায়া এসে চুল বেঁধে পরিধেয় বস্ত্র বদলিয়ে দিয়ে যায়।

করালীচরণ এসে ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে যায়।

আজ কালরাত্রি।

কালরাত্রিতে একসঙ্গে শুতে নেই—স্বামীর স্ত্রীর মুখ দেখতে নেই কিন্তু দিনের বেলা তো কোন বাধা ছিল না—অসিতও কই একবারও এলো না তার ঘরে।

তার যেমন অসিতকে দেখতে ইচ্ছা করছে—অসিতের কি করে নি?

সে রাত্রে মায়াই ওর সঙ্গে শুল ঐ ঘরে।

আশ্চর্য!

মল্লিকা একটিবারের জন্যও চোখ বুজতে পারেনি।

তারপর ভোর হলো—একজন দুজন করে অনেকেই নতুন বৌ দেখতে এলো, কিন্তু মল্লিকার তৃষিত দুটি চোখ যাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল সেই অসিত একবারও এলো না।

দ্বিপ্রহরের সময় একবার মাত্র জানালার সামনে যখন সে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নজরে পড়েছিল তার নিচের আঙ্গিনা দিয়ে অসিত হেঁটে যাচ্ছে।

মল্লিকা ভেবেছিল অসিত কি জানে না যে মল্লিকা ঐ ঘরে আছে—যদি সে একবার উপরের দিকে তাকাত, কিন্তু তাকায় না অসিত!

আজ যদিও ফুলশয্যা—আসল উৎসব কিন্তু কাল।

নীচের আঙ্গিনায় সামিয়ানা খাটানো হচ্ছে, জানালা-পথেই মল্লিকা দেখতে পায়।

সবাই বোধহয় গৃহের আসন্ন উৎসবের ব্যাপারে ব্যস্ত।

মল্লিকা যে একা একা ঐ ঘরে আছে হয়তো কারো মনেই নেই—কারো না মনে থাকুক, অসিতেরও কি একবার মনে পড়লো না।

ঠিক আছে। আজ তো ফুলশয্যার রাত—এক সময় না এক সময় এ ঘরে তো আসবেই অসিত—একটা কথাও তার সঙ্গে ও বলবে না তখন।

কিছুতেই বলবে না।

দুপুর থেকেই সানাই বাজছে—

একা একা ঘরের মধ্যে বসে মল্লিকা এলোমেলো কত কথাই না ভাবে। এ বাড়িতে তো ঐ শাশুড়ি ভবানী দেবী—মামাতো বোন মায়া আর অসিত ছাড়া কেউ নেই—চাকর-বাকরও তো খুব একটা নেই—একমাত্র দেখেছে ঐ পুরনো বুড়ো চাকর করালীচরণকে।

তবে এঘরে অসিতের আসতে বাধাটাই বা কি? তাছাড়া আজকাল আবার এসব কেউ মানে নাকি।

ক্রমে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে নামে কিন্তু মল্লিকাকে কেউই সাজাতে আসে না। এমন কি ঘরটাও কেউ সাজাতে আসে না।

এ আবার কেমন ফুলশয্যার রাত।

তবে কি বিয়ের রাতের মতই এ রাত্রিরও কোন আয়োজন নেই।

এক সময় মায়া ঘরে এসে ঢুকল। সঙ্গে করালীচরণ—তার হাতে একটা টুকরীতে নানা জাতের ফুল ও ফুলের মালা।

মায়া মৃদু হেসে বলে, তোমার ঘর সাজাতে এলাম ভাই—

যা পারে মায়াই করালীচরণের সাহায্যে ফুল দিয়ে ঘরটা সাজিয়ে দেয়—কিন্তু কই মল্লিকাকে তো সাজাল না ফুল দিয়ে।

মায়া এক সময় ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মল্লিকা মনে মনে ভাবে মায়া হয়ত পরে আসবে আবার তাকে সাজাতে।

আজ যে শুভরাত্রি। ফুলশয্যার রাত। সাজতে হয় নতুন বৌকে—।

কিন্তু রাত বাড়তে থাকে মায়া আসে না।

ভবানী দেবীই এক সময় এলেন—পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওকে খেতে দিলেন—শাশুড়ি ভবানী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে মল্লিকার কেন যেন মনে হয় মুখটা ওঁর কেমন ভার-ভার—গম্ভীর।

মল্লিকাকে খাবার পর তার শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে ভবানী দেবী আবার চলে গেলেন ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কোন কথা না বলে।

বাইরে সানাই বাজছে।

ঐ সময়েই বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হয়েছিল কথাটা

মল্লিকার—আলমারি থেকে নিজেই সে শাড়ি গহনা বের করে সেজেছিল।

একটা নেশায় যেন আচ্ছন্ন মল্লিকা।

সেজে বার বার ঘরের মধ্যে টাঙানো প্রমাণ আর্শিতে নিজের চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে।

আর মৃদু মৃদু হেসেছে।

কিন্তু আশ্চর্য—অসিত এখনো আসছে না কেন!

কত রাত করবে আর অসিত।

আজকের রাতে কি ঘুমোতে আছে নাকি?

মল্লিকাও ঘুমোবে না।

কিন্তু অসিত এখনো আসছে না কেন?

পালঙ্কের উপর বসে বসে প্রতীক্ষারত মল্লিকার দুচোখের পাতায় কখন তার নিজের অজ্ঞাতেই ঘুম নেমে এসেছে ও টেরই পায়নি।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল।

সানাইয়ে তখন চেনা সুর বাজছিল দরবারী কানাড়া—অস্পষ্ট কানে এসেছিল ওর সানাইয়ের সুরটা।

ঘরের কোণে শ্বেত-পাথরের উঁচু টুলটার উপর রক্ষিত নীল ঘেরা টোপ ঢাকা টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছিল, তারই মৃদু নীলাভ আলোয় ঘরটা স্বল্পালোকিত, এবং চোখ মেলেই ঘুম-ঘুম চোখে দেখতে পেয়েছিল সামনে দাঁড়িয়ে অসিত।

অসিত।

পালঙ্কের একেবারে সামনেই দাঁড়িয়ে অসিত।

অসিত তারই দিকে যেন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরনে ধুতি।

গায়ে একটা গেঞ্জী মাত্র।

মাথার চুল কেমন যেন বিস্রস্ত—এলোমেলো।

আর দুচোখের দৃষ্টি অসিতের—ও কেমন ধারা চোখের দৃষ্টি—কেমন করে তার দিকে তাকিয়ে আছে অসিত!

চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা আক্রোশ।

কে জানে অসিত কতক্ষণ এসেছে এ ঘরে, হয়ত ওকে অমন করে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছে।

ছি ছি, কখন যে ঘুম এসে গিয়েছে চোখে—

কিন্তু অসিতের চোখের দৃষ্টিতে শুধুই কি আক্রোশ—একটা যেন ঘৃণাও রয়েছে—আরো আরো যেন কি আছে অসিতের চোখের দৃষ্টিতে, মল্লিকার মনে হয়।

মল্লিকা মৃদু হাসে।

কিন্তু অসিতের চোখের দৃষ্টিতে সে হাসির যেন কোন প্রতিধ্বনি নেই।

অসিত ইতিমধ্যে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে পালঙ্কের দিকে। চোখে তার তেমনি দৃষ্টি।

হঠাৎ যেন কি মনে হয় মল্লিকার, কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে যেন ওর সর্বাঙ্গ সিরসির করে ওঠে।

বাইরের দালানে বোধহয় কোথাও ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি দুটো ঘোষণা করে।

খোলা জানালা পথে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আসে। পালঙ্কের বাজুর সঙ্গে ঝোলান মালাগুলো দুলে ওঠে।

মল্লিকার চোখের পাতা দুটো বুঝি আপনা থেকেই বুজে এসেছিল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ও শুনতে পেল—

কে তুমি ?

প্রশ্নটা এমনি আকস্মিক এমনিই অপ্রত্যাশিত এবং গলার স্বরটা এমনি কর্কশ যে মল্লিকা যেন নিজের অজ্ঞাতেই চমকে মুখ তোলে।

সামনের দিকে তাকায়।

অসিতেরই কণ্ঠস্বর সে শুনেছে একটু আগে। অসিতই তাকে প্রশ্নটা করছে নিঃসন্দেহে।

অসিতের ওষ্ঠ দুটি যেন দৃঢ়বদ্ধ।

চোয়ালটা কঠিন হয়ে উঠেছে।

কপালে ভ্রূকুটি।

আর চোখের দৃষ্টিতে শুধু যে আক্রোশই তাই নয়—যেন একটা ক্রুর হিংসা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমস্ত মুখটা যেন কেমন লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছে অসিতের।

কে তুমি?

আবার অসিত প্রশ্ন করে, তার পরই হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খাটের বাজুতে ঝোলানো অমন চমৎকার ফুলের মালাগুলো টেনে টেনে ছিঁড়তে থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ভাঙা কর্কশ গলায় চিৎকার করে ওঠে অসিত, না, না—না—

বিস্ময়ে ভয়ে মল্লিকা ততক্ষণে সিঁটিয়ে উঠেছে।

খাট থেকে নেমে এসে কি এক অজ্ঞাত ভয়ে যেন এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে।

ব্যাপারটা কি?

ও অমন করছে কেন?

ফুলের অমন সুন্দর মালাগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলল কেন? রেগে গেছে নাকি—

ও ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে হয়ত ভীষণ রেগে গিয়েছে।

ভয়ে ভয়ে মল্লিকা স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

অসিত ততক্ষণে পালঙ্কের আরো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর—

অসিত হঠাৎ হাত বাড়িয়ে যেন হিংস্র একটা জন্তুর মত অমন চমৎকার দামী শয্যার চাদর—বালিশগুলো তুলে তুলে ঘরময় ছুঁড়ে ফেলতে লাগল আর সমানে চিৎকার করতে থাকে, না, না, না—

আর আতঙ্কে মল্লিকা ক্রমশঃ অসিতের সামনে থেকে দূরে দূরে সরে যেতে থাকে, একেবারে দেওয়ালের গায়ে এসে নিজেকে যেন লেপটে দেয়।

আর পিছু হটবার পথ নেই।

অসিত তখনো চিৎকার করছে, না—না—

মল্লিকা বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

হয়ত অজ্ঞান হয়েই যেত যদি না ঠিক ঐ মুহূর্তে ওর মামাতো বোন মায়া এসে হন্তদন্ত হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকত।

মায়া সোজা এসে একেবারে অসিতের একটা হাত ধরে চিৎকার করে ডাকল, ছোড়দা—এই ছোড়দা—চল—চল—ওঘরে চল।

না, না—

অসিত মায়ার হাত ছাড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে।

ছোড়দা—

মায়ার চোখেমুখে একটা রীতিমত উৎকণ্ঠা।

মায়া আবার অসিতকে ধরবার চেষ্টা করে।

কিন্তু অসিত যাবে না।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, না, না—

ছোড়দা—

না! অসিত মায়াকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করে।

মায়া আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল—কোনমতে সে নিজেকে সামলে নেয় খাটের বাজুটা ধরে।

তার পরই চিৎকার করে ডাকে, কালীদা—কালীদা—শিগগিরী এসো—

করালীচরণ ইতিমধ্যে চেঁচামেচি শুনে ঐদিকেই আসছিল।

এসে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে করালীচরণ।

রায়বাড়ির বহুদিনকার পুরানো চাকর।

বয়স হয়েছে। পাকানো দড়ির মত চেহারা।

গায়ের রঙ কালো।

করালীচরণ ঘরে এসে ঢুকতেই মায়া চিৎকার করে ওঠে অসিতকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে—অসিত তখন মল্লিকার গলাটা দুহাতে টিপে ধরেছে। মল্লিকা যেমন নিজেকে অসিতের কবল থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল তেমনি মায়াও চেষ্টা করছিল

কালীদা দেখো দেখো—ছোড়দা কি করছে!

করালীচরণ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে অসিতের কবল থেকে মল্লিকাকে ছাড়িয়ে দেয়।

অসিতের একটা হাত চেপে ধরে।

মল্লিকা একপাশে সরে গিয়ে তখন থর থর করে কাঁপছে।

ভয়ে যেন সে কেমন নীল হয়ে উঠেছে।

অসিত করালীচরণের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে।

খোকা—খোকা—

না, না—

খোকা—এই খোকা—লক্ষ্মীটি শোন—করালীচরণ অসিতকে থামাবার শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে।

কিন্তু অসিতের দুচোখে কি এক অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

অসিত করালীচরণকেও ঠেলে ফেলে দেয় প্রথমটায়—অসিত তখন রীতিমত ক্ষেপে গিয়েছে—রীতিমত হিংস্র !

করালীচরণের হাতটা কামড়ে দেয়।

করালীচরণ কোনমতে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে জোরে একটা চড় কষিয়ে দেয় এবারে অসিতের গায়ে।

ঐ একটি চড়েই কাজ হয়। অসিত থমকে দাঁড়ায়।

করালীচরণ অতঃপর অসিতের হাতটা ধরে টানতে টানতে প্রায় একপ্রকার যেন হেঁচড়াতে হেঁচড়াতেই ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় তাকে।

মল্লিকা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে কখন একসময় শাশুড়ী ভবানী দেবী ঘরের মধ্যে এসে এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ও জানতেও পারে নি।

পরনে সেই দুধ-গরদের থান। সেই সৌম্য শান্ত মুখ।

রুক্ষ মাথার কেশ ঘোমটার ফাঁকে কাঁধের ও বুকের ওপরে কিছুটা এসে পড়েছে।

শ্বেতপাথরের মত সাদা যেন গাত্রবর্ণ !

এতক্ষণে ভবানী দেবীর প্রতি নজর পড়ে মল্লিকার।

ভবানী দেবীও মল্লিকার মুখের দিকেই তখন তাকিয়ে ছিলেন।

মায়া নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার যাওয়া হল না। হঠাৎ মল্লিকার ডাক শুনে সে থমকে দাঁড়াল।

মায়াদি—

মায়া তাকাল মল্লিকার মুখের দিকে।

মায়া মল্লিকার চাইতে বয়সে বছর তিন-চার বড় হবেই বলে মনে হয়।

খুব ছোটবেলা থেকেই সে ভবানী দেবীর কাছে আছে। মায়া ভবানী দেবীর দূর-সম্পর্কীয় ভাইয়ের মেয়ে ; মায়ার মার অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছিল—মায়ার বয়স যখন মাত্র সাত কি আট।

তার পর দু বছরও গেল না হঠাৎ মায়ার বাবারও মৃত্যু হল মাত্র দু দিনের জ্বরে।

সংবাদ পেয়ে ভবানী দেবীই গিয়ে মায়াকে গ্রাম থেকে নিয়ে আসেন।

মেয়েটাকে দেখবার আর কেউ নেই—কাজেই সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। সেই থেকেই তো মায়া এখানে। ভবানী মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন মায়াকে।

তার পর বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেন নি।

এক জায়গায় বিয়ে যখন প্রায় ঠিকঠাক হয়ে এসেছে মায়া হঠাৎ বেঁকে বসলো।

বললে, না পিসীমা—

না কি রে ?

না বিয়ে আমি করব না।

বিয়ে করবি না ? কি বলছিস ?

বললাম তো বিয়ে আমি করব না—

তাই কি হয় নাকি—মেয়েমানুষ বিয়ে না করলে চলে নাকি ?

কতভাবে বোঝালেন ভবানী দেবী।

কিন্তু মায়ার ঐ এক কথা। বিয়ে সে করবে না। কিছুতেই না।

অনন্যোপায় ভবানী দেবী বিয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙে দিতে বাধ্য হলেন।

তার পরও আর একবার চেষ্টা করেছিলেন ভবানী দেবী কিন্তু মায়ার মুখে সেই একই কথা।

পিসীমা তোমাকে তো বলেই দিয়েছি, বিয়ে আমি করব না।

কিন্তু কেনই বা করবি না ?

সে কথার আর জবাব দেয় নি মায়া।

মাথা নীচু করে থেকেছে।

কিন্তু আমি তো চিরদিন বেঁচে থাকব না রে। তখন মেয়েছেলে মাথার উপর একজন অভিভাবক না থাকলে দেখবে কে ?—তা ছাড়া অসিতের বিয়ে হলে যদি তার বৌ—।

তোমাকে ভাবতে হবে না। লেখাপড়া তো শিখিয়েছো—আমার ব্যবস্থা আমি করে নেবো সত্যিই তেমন যদি কিছু হয়।

ব্যাপারটা সত্যিই দুর্বোধ্য ঠেকেছিল ভবানীর কাছে।

কিছুই বুঝতে পারেন নি—মায়া দেখতে কুচ্ছিত নয়—উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণের ওপরে চমৎকার একটা দেহশ্রী আছে—লেখাপড়া শিখেছে—স্বাস্থ্যও ভাল, কোন রোগ নেই, তবে কেন সে বিয়ে করতে চায় না ?

কিন্তু ভবানী করবেন আর কি ?

মেয়েটা যখন বিয়ে কিছুতেই করবে না—কি আর ভবানী করতে পারেন, মায়া ঐ ভাবেই থেকে গেল।

॥ ৩ ॥

মল্লিকার ডাকে মায়া ফিরে দাঁড়ায় বটে কিন্তু যেন মাথাও তুলতে পারে না—মল্লিকার মুখের দিকে তাকাতেও পারে না।

ঘরের মধ্যে যেন একটা পাষাণভার স্তব্ধতা। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ করে আনতে চায়।

পালঙ্কের বাজুতে ঝোলান ফুলের মালাগুলো কেবল খোলা জানালা পথে আসা শীতের হাওয়ায় মৃদু মৃদু দুলছে থেকে থেকে।

মল্লিকাই আবার স্তব্ধতা ভঙ্গ করে। বলে, এ-সব কি মায়াদি, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

মল্লিকার কথায় বারেকের জন্য বুঝি মায়া ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বোঝা যায় ওর মুখের দিকে চেয়ে ও যেন বলবার থাকলেও কিছু বলতে পারছে না।

কথা বলছো না কেন মায়াদি—উনি, উনি—অমন করছিলেন কেন?

মল্লিকার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট একটা সংশয় যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

মায়া তখনো চুপ করেই আছে। বিব্রত—দ্বিধাগ্রস্ত—বিমূঢ়।

একবার যেন মনে হলো মায়া অদূরে ঘরের মধ্যে প্রস্তরমূর্তির মত দণ্ডায়মান ভবানী দেবীর মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর আবার চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

মায়াদি চুপ করে থাকলে ত অমন করে চলবে না। আমি জানতে চাই—বল কেন উনি অমন করছিলেন। উনি—উনি কি তবে সুস্থ নন?

মল্লিকা যেন তার মনের সন্দেহটা আর চেপে রাখতে পারে না। কথাটা তার মুখ থেকে এবারে বের হয়েই পড়ে।

মায়া বুঝি বলবার চেষ্টা করে, না, না—বৌদি—সুস্থ—হ্যাঁ সুস্থ বৈকি—

সুস্থ—কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ অমন ব্যবহার করতে পারে—আমার ত মনে হলো তোমার ভাই একটা পাগল—উন্মাদ—একটু আগে—

না, না—বৌদি—না—বোধহয় তো কয়দিনের অনিয়মে—স্ট্রেনে—হঠাৎ—তাছাড়া ছোড়দা মানুষের ভিড় একদম সহ্য করতে পারে না কোনদিন—কারো সঙ্গে কখনো বড় একটা মেশেনি—

অনিয়মে—স্ট্রেনে—তুমি কি আমাকে একটা কচি বাচ্চা মেয়ে পেয়েছো যে যা খুশি তোমরা বলবে আর আমি সেটা মেনে নেবো! সত্যি করে বলো এখনো—যতদূর আমি বুঝতে পারছি—he is not at all normal—নিশ্চয়ই ওর মাথার দোষ আছে, তোমরা—

কি বলছো তুমি বৌদি—না, না—বিশ্বাস করো—

বিশ্বাস—কি বিশ্বাস করবো—যে ব্যাপার একটু আগে তোমার ভাই এই ঘরের মধ্যে করে গেলেন, তারপরও তোমরা আমাকে বিশ্বাস করতে বল যে—

মায়া যেন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ ভবানী দেবীর কণ্ঠস্বর তার কানে যেতেই সে থমকে ভবানী দেবীর মুখের দিকে ফিরে তাকাল।

বৌমা—

পিসীমা—মায়া তাড়াতাড়ি বোধহয় তার পিসীমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে।

না মায়া, ভবানী দেবী দৃঢ় এবং শান্ত কণ্ঠে থামিয়ে দিলেন যেন মায়াকে। বললেন, না, ওকে জানতে দে মায়া—

পিসীমা—

মায়া বুঝি শেষবারের মত চেষ্টা করে, পিসীমা—

কিন্তু ভবানী দেবী মায়ার মুখের দিকে ফিরেও তাকালেন না আর—

পুত্রবধূর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না বৌমা—তবে—তুমি যা ভাবছো তা নয়—ও পাগল নয়—

পাগল নয়—সুস্থ। কিন্তু পাগল বিকৃতমস্তিষ্ক না হলে কেউ শুনেছেন কখন তার নিজের সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে ফুলশয্যার রাত্রে গলা টিপে খুন করতে আসে—

ছি ছি বৌমা, এ তুমি কি বলছো—অসিত—

আসেনি, আসেনি আপনার ছেলে একটু আগে আমার গলা টিপে ধরতে, মায়াদি ঐ সময় আমার চিৎকার শুনে না এসে পড়লে—ও নিশ্চয়ই আমাকে গলা টিপে শেষ করে দিত।

ভবানী দেবী অতঃপর নিঃশব্দে যেন মুহূর্তকাল কি ভাবলেন, তারপর এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে পুত্রবধূর মুখোমুখি একেবারে দাঁড়ালেন।

শোন মল্লিকা, বুঝতে পারছি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছো

না—কিন্তু আমি সত্যিই বলছি বৌমা, অসিতের আজকের ব্যবহারে আমিও কম আশ্চর্য হইনি—কেন যে হঠাৎ অমন করলো ও—

তার কারণ আপনার ছেলে সুস্থ নয়—পাগল, একটা বদ্ধ উন্মাদ—আর সেই কথাটাই এখনো আপনারা স্বীকার করতে চাইছেন না—

ভবানী দেবী আর প্রতিবাদ করলেন না পুত্রবধূর কথায়। কেবল বলে যেতে লাগলেন, এ সংসারে ও একা—দ্বিতীয় ওর ভাই বা বোন কোনদিনই ছিল না—তাছাড়া চিরদিন ও একটু ঘরকুনো—শান্ত—লাজুক প্রকৃতির। নিজের পড়াশুনা ও ছবি আঁকা নিয়েই আছে—কারো সঙ্গে ও কখনো মেশেনি—আমিও মিশতে দিইনি, সেই কারণেই ও সংসারে আর দশজন ছেলে যা তোমরা দেখো ও জানো তাদের কারো মতই ও নয়—

পাশের ঘরেই বোধহয় করালীচরণ অসিতকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল—পাশের ঘর থেকে চিৎকার ও শব্দ ভেসে আসছিল।

মল্লিকা ভবানী দেবীর সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, শুনতে পাচ্ছেন—ঐ শুনুন—কান পেতে শুনুন আপনার শান্তশিষ্ট ছেলের চেঁচামেচি—কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, নিজে মেয়েমানুষ হয়ে আর একটা সম্পূর্ণ নিরপরাধ মেয়ের জেনেশুনে এতবড় সর্বনাশটা কেন করলেন? আমার ঋষির মত বাবাকে মিথ্যা দিয়ে এতবড় প্রতারণা কেন করলেন?

ভবানী দেবী যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গিয়েছেন।

তাঁর সমস্ত যুক্তি-তর্ক যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

পাশের ঘর থেকে অসিতের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

ও কে—কে—কেন—কেন এসেছে এ বাড়িতে—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অসিত চেঁচাচ্ছে।

বলুন—কি করেছিলাম আমরা আপনার যে এতবড় জঘন্য প্রতারণা আমাদের সঙ্গে আপনি করলেন? এখন বুঝতে পাচ্ছি ছেলে আপনার পাগল উন্মাদ বলেই—সর্ব ব্যাপারে প্রথম থেকেই এত গোপনতা—এইরকম করে লুকিয়ে-চুরিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন আপনি—কিন্তু কেন—কেন এ কাজ করলেন?

বৌমা—

ভবানী দেবীকে যেন একটা ঝাপটা দিয়ে থামিয়ে দিল মল্লিকা, থামুন, বৌমা—কে আপনার বৌমা—আমি আপনার কেউ নই—এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি—

মল্লিকা দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি বাধা দেন ভবানী দেবী, শোন বৌমা—শোন—

এতক্ষণ ধরে অনেক শুনিয়েছেন, আর শোনবার কিছু নেই আমার —সরুন, পথ ছাড়ুন, যেতে দিন আমাকে—আপনাদের মুখ দেখতে পর্যন্ত আমার ঘৃণা হচ্ছে!

মল্লিকা আবার এগুবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভবানী দেবী পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকেন, বৌমা—শোন, একটা কথা শোন—তোমার কথাই আমি মেনে নিচ্ছি মা—আমরা অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি—প্রতারণা করেছি কিন্তু এভাবে এই রাত্রে তুমি চলে যেও না—

না, না—আর এক মুহূর্তও এখানে নয়—যেতে দিন আমাকে—আর একটা রাতও এখানে থাকলে আমিই হয়ত পাগল হয়ে যাবো।

শোন মল্লিকা, তোমায় মিনতি করছি মা, এভাবে এই রাত্রে তুমি চলে যেও না।—কেবল আজকের রাতটা ও কালকের রাতটা তুমি থাক। আত্মীয়স্বজনে বাড়ি আমার ভর্তি—কাল উৎসব—

উৎসব! এর পরেও আপনার উৎসবের কথা মনে হচ্ছে? কথাটা মুখে আনতে আপনার লজ্জা করছে না?

তবু—তবু রায়বাড়ির এই উৎসব যে ভাবে হোক আমাকে করতেই হবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি পরশু সকালেই তুমি যেখানে যেতে চাও আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো—আমার ছেলে তোমার ছায়াও মাড়াবে না। রায়বাড়ির ইজ্জৎকে এমনি করে তুমি ধূলায় লুটিয়ে দিও না মা।

ইজ্জৎ—সরুন পথ ছাড়ুন—আমি যাবোই—

শুধু আজকের আর কালকের রাতটা আমাকে তুমি ভিক্ষা দাও মা—তোমার পায়ে পড়ি—বলতে বলতে সত্যিই বুঝি ভবানী দেবী

দু'পা এগিয়ে আসেন মল্লিকার দিকে—তারপর আবার বলেন, যেখানে তুমি যেতে চাও পরশু সকালেই তোমাকে আমি পাঠিয়ে দেবো—শুধু আজকের আর কালকের রাতটা—

ভবানী দেবীর গলার স্বর বুঝি কান্নায় বুজে আসে।

মায়া এতক্ষণ পাথরের মতই যেন এসে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে একবার বলে, মল্লিকা—লক্ষ্মীটি অমত করো না—দুটো রাত তুমি থেকে যাও—

মল্লিকা কি জানি কেন যাবার কথা আর বলে না।

ভবানী দেবীর বারংবার মিনতির জন্যই হোক বা শীতের এই মধ্য রাত্রে একা একা এখন বের হয়ে এই অচেনা জায়গায় কোথায়ই বা যাবে ভেবেই হোক, মল্লিকা আর কোন কথা বলে না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কি বল, থাকবে তো মা। ভবানী দেবী আবার শুধান।

মল্লিকা কেবল তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাকায় ভবানী দেবীর মুখের দিকে—কোন কথা বলে না—

ধীরে ধীরে গিয়ে এক সময় খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়ায় মল্লিকা নিঃশব্দে।

ভবানী দেবী ধীরে ধীরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

মায়াও ঘর ছেড়ে চলে যায়—

ঢং—ঢং—ঢং রাত তিনটে বাজল।

মল্লিকা জানালার সামনে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়েই ছিল।

সে ভাবছিল এ কি হলো!

একটা পাগলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল!

অসিত সত্যি সত্যিই তাহলে পাগল!

উঃ, মাথাটার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে, একটা অসহ্য জ্বালা শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে যেন।

পাগল—অসিত—পাগল!

চক্রান্ত করে একটা পাগলের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে এরা।

বাবা—বাবাগো, এ আমার কি হলো!

দুঃখে কান্নায় যেন ভেঙ্গে পড়ে মল্লিকা, দু'হাতে মুখ ঢাকে।

সমস্ত বাড়িটা যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এদের তো বিশ্বাস নেই।

যারা এত বড় প্রতারণা করতে পারে, তারা পারে না পৃথিবীতে এমন কোন কাজই হয়ত নেই—

কে বলতে পারে এমনি করে তারা তাকে আটকে আরো কোন মতলব হাসিল করতে চায় কিনা।

না, না—এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

বিশ্বাস নেই—ভবানী দেবীকে আর বিশ্বাস নেই—তাছাড়া সে আর এখানে কেনই বা থাকবে!

যারা তার সঙ্গে এতবড় জঘন্য প্রতারণা করেছে—তার এতবড় সর্বনাশ করেছে তাদের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না।

কে যেন ঐ সঙ্গে ভিতর থেকে কেবলই ঠেলতে থাকে মল্লিকাকে, পালা—পালা মল্লিকা, এখান থেকে এই মুহূর্তে পালা—চলে যা—হয়ত এরা কোন দিনই আর তোকে এ বাড়ি থেকে বেরুতে দেবে না—

মল্লিকা চকিতে এদিক ওদিক তাকাল।

ভেজান দরজাটা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল—কেউ নেই কোথায়ও—পাশের ঘরে অসিতের চিৎকারও থেমে গিয়েছে।

কে জানে হয়ত হাত-পা বেঁধে মুখ বেঁধে পাগলটাকে ওরা রেখে দিয়েছে—সিঁড়ি দিয়ে একতলায় ও নেমে এলো।

মুখের ওপরে ঘোমটাটা টেনে দিল—নীচের একটা ঘরে কারা যেন তরকারী কুটছে—তাদের গুন গুন আলোচনা শোনা যায়।

না—সদর দিয়ে নয়।

পিছনের—খিড়কীর দরজা দিয়ে ও বের হয়ে যাবে। বিয়ের রাত্রে পাল্কীতে করে যে দরজা দিয়ে ওরা তাকে এ বাড়িতে এনেছিল।

॥ ৪ ॥

খিড়কীর দরজা দিয়েই মল্লিকা বের হয়ে এলো রায়বাড়ি থেকে।

তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়লো।

কুয়াশা নেমেছে চারিদিকে।

কুয়াশা ক্রমশঃ ঘন হয়ে আসছে আরো। চারিদিক অস্পষ্ট ঝাপসা।

নির্জন রাস্তা—একটি জনপ্রাণীও চোখে পড়ে না।

সেই ঝাপসা কুয়াশার মধ্যে দিয়েই দিগবিদিগ্‌হারা হয়ে ছুটতে থাকে মল্লিকা। পরনে দামী বেনারসী শাড়ী।

এক গা ভর্তি গহনা—যেমন সে নিজে নিজে ঐ রাত্রে পরেছিল তেমনিই সব আছে।

চুড়ি, বালা কঙ্কণ, চুড়—কানপাশা—সিঁথিমৌর—

তাছাড়া গোড়ের মালা।

শাড়ীর আঁচলটা খসে পড়েছে।

ছুটছে মল্লিকা।

যেমন করে হোক তাকে পালিয়ে যেতে হবে—দূরে অনেক দূরে এদের নাগালের বাহিরে।

ঐ শীতের হিমঝরা রাত্রেও মল্লিকার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে গুরু পরিশ্রমে।

ছুটতে ছুটতে এক সময় সামনে দেখতে পেল একটা সাইকেল রিকশা—উল্টো দিক থেকে বোধহয় স্টেশনে সওয়ারী পৌছে দিয়ে ফিরে আসছিল।

এই—এই রিকশাওয়ালা—থাম—থাম—

রিকশাওয়ালা সামনে এসে রিকশা থামায়, কিধার জায়গা মাঈজী?

স্টেশন—আমাকে একটু স্টেশনে পৌছে দেবে?

লেকেন আভি তো কোই গাড়ি নেই হ্যায় মাঈজী।

কলকাতায় যাবার কোন গাড়ি নেই?

নেই—সেই সুবা—সাড়ে পাঁচ বাজে—সাড়ে তিন বাজেকা মেল

গাড়ি আপকো তো নেহি মিলেগি—

পাবো পাবো—নিশ্চয়ই পাবো—তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও—চলতে চলতে মল্লিকা রিকশার উপর উঠে বসে।

জলদি চলো—জোরসে চল।

লেকেন মাঈজী—

চলো না—তুম বহুৎ বকশিশ মিলেগা—জলদি চলো।

চলিয়ে—

রিকশাওয়ালা প্রাণপণে প্যাডেল করতে থাকে, ঝড়ের বেগে সাইকেল রিকশাটা যেন চালায়।

স্টেশনে এসে যখন ওরা পৌঁছাল—সিগন্যাল ডাউন হয়েছে—গার্ডের নীল আলো দুলছে—

হাতের একটা চুড়ি হাত থেকে খুলে রিকশাওয়ালার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্টেশনের বাইরে লাইন ধরে ছুটতে শুরু করে মল্লিকা।

ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে তখন।

কোনমতে দৌড়োতে দৌড়োতে গিয়ে চলন্ত গাড়ির দরজার একটা হ্যাণ্ডেল শক্ত মুঠিতে ধরে ও চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়ে।

ট্রেনটা তখন বেশ স্পীড্ নিয়েছে।

হ্যাণ্ডেলটা ধরে হাঁপাচ্ছিল তখনো মল্লিকা—হঠাৎ কম্‌পার্টমেণ্টের দরজাটা খুলে গেল এবং সবল একটা পুরুষের হাত এগিয়ে এসে তাকে এক টানে কমপার্টমেণ্টের মধ্যে টেনে নিল।

গাড়িটা তখন একটা ব্রীজ পার হচ্ছে।

সেই টানের চোটে আলোকিত কমপার্টমেণ্টটার মধ্যে যেন মল্লিকা হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে।

পুরুষের গলায় তীক্ষ্ণ তীরস্কার শোনা গেল, ছি ছি, এভাবে চলন্ত ট্রেনে উঠতে আছে—আর একটু হলেই যে বিশ্রী অ্যাকসিডেণ্ট—

কিন্তু কথাটা তার শেষ হলো না।

হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল বক্তা এবং পরক্ষণেই তার গলা দিয়ে বিস্ময়কর প্রশ্নটা যেন বের হয়ে এলো, তুমি—

মল্লিকাও ততক্ষণে যেন চমকে বক্তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে।

বিস্মিত সেও কম হয়নি।

বিস্ময়ে মুহূর্তের জন্য সেও যেন সত্যিই বোবা হয়ে গিয়েছিল।

মল্লিকার কণ্ঠ হতে আপনা হতেই যেন বের হয়ে আসে কথাটা।

সুহাস।

সুহাস তখনো মল্লিকার মুখের দিকেই তাকিয়েছিল।

মলি, তুমি কাঁপছো—বোস, বোস—

সুহাস বলে, এবং কথাটা বলে সুহাসই মল্লিকার হাতটা ধরে তাকে সামনের বার্থের উপরে বিস্তৃত শয্যায় বসিয়ে দেয়, বোস—

সত্যিই মল্লিকা কাঁপছিল।

তার সমস্ত শরীরটাই কাঁপছিল। চলন্ত গাড়ির খোলা জানালা পথে হু হু করে শেষ রাত্রির শীতের হাওয়া আসছিল।

তোমার শীত করছে না—দাঁড়াও জানালাটা বন্ধ করে দিই—

বলতে বলতে সুহাস জানালার কাচের শার্সিটা তুলে দেয়। বার্থের উপর একপাশে একটা দামী কম্বল ছিল, সেটা তুলে মল্লিকার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, এইটা গায়ে জড়িয়ে বোস—

না, না—তুমি ব্যস্ত হয়ো না—মল্লিকা বলে। আমার শীত করছে না তেমন—

তা হোক—জড়িয়ে নাও কম্বলটা—বলতে বলতে সুহাসই কম্বলটা মল্লিকার গায়ে জড়িয়ে দেয়। আবার বলে সুহাস, you need a pick-up—দাঁড়াও আমার ফ্লাস্কে বোধ হয় গরম কফি আছে—

সুহাস কথাটা বলে এগিয়ে গিয়ে কামরার দেওয়ালে হ্যাঙারে ঝোলান ফ্লাস্কটা নামিয়ে কাপে এক কাপ গরম কফি ঢেলে বলে, have it—এটা খেয়ে নাও—You will feel comfortable।

মল্লিকা কম্পিত হাতে কফির কাপটা নিয়ে ধীরে ধীরে বার দুই চুমুক দিয়ে কফির কাপটা নীচে নামিয়ে রেখে দিল।

সত্যিই গলাটা শুকিয়ে তার কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

এত যে পিপাসা পেয়েছিল সে যেন জানতেই পারেনি।

খেলে না কফিটা ? সুহাস শুধায়।

না।

মল্লিকা জানালাটার গায়ে হেলান দিয়ে বসল।

সুহাস চেয়ে চেয়ে দেখছিল মল্লিকাকে।

মাথার চুল বিস্রস্ত।

সিঁথিতে ও দুই ভ্রূর মধ্যখানে লাল টকটকে সিন্দুর-চিহ্ন যেন জ্বল জ্বল করছে।

পরনে বহু মূল্যবান বেনারসী শাড়ি—গাড়ির আলোয় সোনার জরির ফুলগুলো চিক্ চিক্ করছে।

গা ভর্তি অলঙ্কার—

যেন প্রথমটায় একটু ইতস্তত: করে সুহাস, তারপর মৃদু কণ্ঠে ডাকে, মলি—

উঁ—

মল্লিকা যেন চমকে সুহাসের মুখের দিকে তাকাল।

এখানে কোথায় এসেছিলে ?

এখানে!

হ্যাঁ ?

মল্লিকা কোন কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

মলি—কিছু মনে করো না, আমি যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

কি ?

মানে একা তুমি—গা-ভর্তি গহনা—ঐ বেশ—মাঝরাত্রে অমন করে ছুটতে ছুটতে এসে ট্রেন ধরলে—সত্যি তুমি ভীষণ রিস্‌ক্ নিয়েছো।

রিস্‌ক্!

নয়—একটা বিশ্রী অ্যাকসিডেণ্ট যদি ঘটে যেত—

মল্লিকা সুহাসের কথার কোন ভাল-মন্দ জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে। মনে হয় অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ও ভাবছে।

সুহাসই আবার কথা বলে, লক্ষ্ণৌ ছাড়বার আগে তোমার বিয়ের

পাকা কথা আমি শুনে এসেছিলাম—মস্তবড় জমিদারবাড়ির একমাত্র ছেলে।

ওসব কথা থাক সুহাস—

সহসা যেন সুহাসকে থামিয়ে দেয় মল্লিকা, তার কণ্ঠস্বরে যেন একটা বিরক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিয়ে কি তোমার এই দিকেই—মানে তোমার শ্বশুরবাড়ি—

সুহাসকে আবার বাধা দেয় মল্লিকা, সুহাস—please—তারপরই কতকটা যেন আত্মগত ভাবে মল্লিকা বলে, এত ঘুম পাচ্ছে—

শোও না ওখানে, শুয়ে পড় না। সস্নেহে সুহাস বলে।

শোবো ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—শোও।

মল্লিকা আর দেরি করে না, পা ছুটো তুলে সোজা টান টান হয়ে বার্থের উপরে পাতা সুহাসের শয্যাটার উপরেই শুয়ে পড়ে।

চোখ বোজে।

গাড়ির অন্যদিককার জানালাটা খোলা ছিল—সুহাস উঠে গিয়ে উল্টোদিককার বার্থে বসল।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো।

খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

কামরাটার মধ্যে ওরা দুজন ছাড়া আর তৃতীয় কোন প্রাণী ছিল না—রিজার্ভ কুপে।

হাতঘড়িটার দিকে তাকাল সুহাস : রাত সোয়া চারটে—

ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগ্রেট ধরালো সুহাস।

একবার ফিরে তাকাল ও পাশের বার্থে শায়িতা মল্লিকার মুখের দিকে।

মল্লিকা—মলি—

মাথায় যখন সিন্দুরচিহ্ন রয়েছে—নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

ওর বাবা মহেন্দ্রনাথ তো বলেছিলেন বিরাট ধনী—কলকাতায় দু-তিনখানা বাড়ি—মস্তবড় ব্যবসা—একমাত্র ছেলে।

বুঝলে সুহাস—এমন ঘর থেকে যে মল্লিকার সম্বন্ধ আসবে এ যেন আমি কোন দিন ভাবতেই পারিনি—খুব সুখে থাকবে কি বল ?

নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ—ছোট বেলায় মল্লিকার মা মারা গেছেন—ভবানী দেবীর কাছে ও মায়ের স্নেহআদর পাবে—একমাত্র ছেলের বৌ তো—

কিন্তু এই মুহূর্তে সুহাসের মনে হচ্ছে—নিশ্চয়ই কোথায়ও একটা গোলযোগ ঘটেছে। নচেৎ এভাবে একা একা মলি এসে ঐ বেশ-ভূষায় ট্রেনই বা ধরবে কেন, আর শ্বশুড়বাড়ির নামে অমন করে বিরক্ত হয়েই বা উঠবে কেন ?

মল্লিকার মুখের দিকে আবার তাকাল সুহাস।

চোখ দুটো বোজা। গাড়ির দুলুনিতে শায়িত দেহটাও দুলছে—

হঠাৎ ঐ সময় মল্লিকার বাঁ হাতের মণিবন্ধের দিকে নজর পড়ে সুহাসের—লাল সুতো বাঁধা একটা সাদা শাঁখা—সদ্য বিবাহের চিহ্ন।

॥ ৫ ॥

মাথার সমস্ত সিঁথিটা সিন্দূরে একেবারে লেপা—হাতে ঐ সুতো বাঁধা শাঁখা—এ যে মনে হয় সদ্য বিবাহের চিহ্ন।

তবে কি দু-একদিনের মধ্যেই ওর বিয়ে হয়েছে!

কিন্তু মল্লিকার কথাই বা সুহাস আজ এত ভাবছে কেন? কি সম্পর্ক আজ ওর সঙ্গে তার ?

মল্লিকা আজ কত দূরে চলে গিয়েছে।

মল্লিকা আজ পরস্ত্রী। পর হতেও পর, দূর হতেও দূরের জন।

অথচ ঐ মল্লিকাকে কেন্দ্র করেই কি একদিন সুহাস তার জীবনটা রঙে রসে স্বপ্নে ভরিয়ে তোলবার স্বপ্ন দেখেনি মনে মনে ?

ভেবেছিল বিলেত থেকে ফিরে এসে মল্লিকার বাবা মহেন্দ্রনাথের কাছে সে-কথাটা উত্থাপন করবে। লক্ষ্ণৌ শহরে অনেক দিন ওদের পাশাপাশি

বাড়িতে কেটেছে বলতে গেলে প্রায়—মাত্র দুটো বাড়ির ব্যবধান।

আলাপ অবিশ্যি সুহাসই একদিন যেচে মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়ে করেছিল। গান বাজনার শখ ছিল সুহাসের আর মহেন্দ্রনাথ ছিলেন লক্ষ্ণৌ শহরে নাম করা একজন গাইয়ে।

মহেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে ও বলেছিল, আমাকে যদি একটু শিক্ষা দেন—

সুন্দর—বলিষ্ঠ—সুগঠিত চেহারা—বুদ্ধি দীপ্ত দুটি চোখ মহেন্দ্রনাথের সুহাসকে দেখেই ভাল লেগেছিল।

বলেছিলেন, কোথায় থাক তুমি—

দুটো বাড়ির পরে—

মানে এই পাড়াতেই?

হ্যাঁ।

কার ছেলে তুমি? কি নাম?—

সুহাস চক্রবর্তী—আমি আমার মামার কাছে মানুষ—ব্যারিস্টার মুখার্জীর ভাগ্নে আমি—

ব্যারিস্টার সাহেবের ভাগ্নে—তা কি নাম তোমার বাবা?

সুহাস চক্রবর্তী।

ব্যারিস্টার মুখার্জী সাহেবকে লক্ষ্ণৌ শহরে চিনত না এমন লোক ছিল না কেউ। ব্যাচিলার মানুষ—প্রচুর ইনকাম করেন—কিন্তু সঞ্চয়ের ঘর শূন্য, কারণ একে ওকে সাহায্য করতে করতেই হাত খালি হয়ে যায়।

মহেন্দ্রনাথ বলেন, গান গাইতে পার তুমি?

একটু একটু—

গাও তো দেখি একটা গান—গাও না লজ্জা কি—গাও—

সুহাস গান গায় একটা।

গান শেষ হলে মহেন্দ্রনাথ বলেন, বাঃ, বেশ গলা তোমার—এসো আমি শেখাবো তোমাকে।

সুহাস অতঃপর মহেন্দ্রনাথের ওখানে নিয়মিত আসা যাওয়া শুরু করে।

আর সেই সময়ই একদিন কিশোরী মল্লিকার সঙ্গে তার আলাপ।

সুহাস মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটা ঠুংরী গাইছিল—মল্লিকা এসে ঘরে ঢোকে। সুহাসের মিষ্টি গলায় সে আকৃষ্ট হয়েছিল।

গান শেষ হতে মল্লিকা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু মহেন্দ্রনাথ কন্যাকে ডাকলেন, আয়, আয় শোন, সুহাসের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিই—ব্যারিস্টার মুখার্জী সাহেবের ভাগ্নে—আমার কাছে গান শিখতে আসে—আর সুহাস এই আমার একমাত্র মেয়ে মল্লিকা—

অতঃপর ক্রমশঃ সেই আলাপ ওদের আরো নিবিড় হয়।

দুজনে কাছাকাছি আসে।

সুহাস তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র—পড়া প্রায় শেষ করে এনেছে—আর মল্লিকা বি. এ. পড়ছে।

ব্যারিস্টার মুখার্জী সাহেব মারা গেলেন—এবং মুখার্জী সাহেবের মৃত্যুর পর দেখা গেল বসতবাড়িটিও বাঁধা রয়েছে মহাজনের কাছে।

বাড়ি বেচে সুহাস মামার সমস্ত ধার শোধ করে দিল—তারপর মেডিকেল কলেজের মেসে উঠে গেল।

ফাইন্যাল পরীক্ষা যত কাছে আসে সুহাসের গান শেখার ব্যাপারটা তত শিথিল হয়ে আসে।

তাহলেও দুজনে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতো।

পাস করলো সুহাস তারপর বিলেত চলে গেল একটা বৃত্তি যোগাড় করে। এবং দুবছর বাদে উচ্চশিক্ষা নিয়ে একদিন আবার লক্ষ্ণৌ শহরেই ফিরে এসে একটা হোটেলে উঠল।

মনে মনে স্থির করেছিল সে লক্ষ্ণৌ শহরেই চেম্বার খুলে প্র্যাকটিস করবে।

হোটেলে উঠেই জিনিসপত্র রেখে সুহাস মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

এবং সেই দিনই শুনলো মহেন্দ্রনাথের কাছে, হঠাৎ নাকি মল্লিকার বিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছে—

সংবাদটা যেন সুহাসকে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত অসাড় করে দেয়।

কি বলবে হঠাৎ ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না।

মহেন্দ্রনাথ যখন আসন্ন আনন্দোৎসবের কথা ভাবতে ভাবতে বলে চলেছেন, তুমি এসে পড়েছো সুহাস আমি যে কি খুশি হয়েছি—

সুহাস কিন্তু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে যাবার জন্য, বিস্মিত মহেন্দ্রনাথ শুধান, তুমি উঠছো নাকি ?

হ্যাঁ মেসোমশাই উঠি।

ঘনিষ্ঠতার পর সুহাস মহেন্দ্রনাথকে মেসোমশাই বলে ডাকত।

উঠবে ? মল্লির সঙ্গে দেখা করবে না, সে হয়ত এখুনি ফিরবে।

না—এখন একটু কাজ আছে। কাল পরশু এক সময় আসবো।

সুহাস আর বসেনি—উঠে চলে এসেছিল।

মনে মনে যে কল্পনায় স্বপ্নের জাল বুনছিল এতদিন ধরে সুহাস—মুহূর্তে যেন সেটা ছিঁড়ে একেবারে টুক্‌রো টুকরো হয়ে গিয়েছে।

লক্ষ্ণৌ শহরে থেকে আর কি হবে ! লক্ষ্ণৌ শহরে থাকলে এর পর পুরাতন স্মৃতিই হয়ত বার বার তাকে পীড়া দেবে।

তাছাড়া লক্ষ্ণৌর সমস্ত আকর্ষণ তো মল্লিকাই। সেই মল্লিকাই যখন থাকছে না—তখন আর লক্ষ্ণৌ শহর কেন।

হোটেলে উঠে ঠিক করেছিল সুহাস একটা ছোটখাটো বাসা দেখে উঠে যাবে।

নতুন করে লক্ষ্ণৌ শহরে বাসা বাঁধবে।

কিন্তু আর তো তার প্রয়োজন নেই—

হোটেলে ফিরে এসে হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে সেই রাত্রেই লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চলে আসে সুহাস কলকাতায়।

বিলিতী ডিগ্রীর জোরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটা ভিজিটিংয়ের পোস্ট যোগাড় করে নিতে খুব বেশী কষ্ট পেতে হয়নি সুহাসের।

এক বন্ধুর সাহায্যে একটা ফ্ল্যাটও পেয়ে গেল—এবং সেই ফ্ল্যাটেরই একটা ঘরে চেম্বার করে প্র্যাকটিস্ শুরু করে দেয় সুহাস।

একটা কনস্যালটেশনের ব্যাপারে লালগোলা থেকে সুহাস ফিরছিল।

ঘুমোয় নি মল্লিকা।

চোখে তার ঘুম ছিল না—কেবল চোখ বুজে বার্থের শয্যায় পড়েছিল।

পরনে দামী বেনারসী শাড়ী—গা ভর্তি গহনা—কেমন যেন একটা বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করতে থাকে মল্লিকা।

উঠে বসে এক সময়।

কি হলো, ঘুম হলো না? সুহাস শুধায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

না—গা থেকে এগুলো না নামাতে পারলে যেন স্বস্তি পাচ্ছি না—আমাকে একটা সাধারণ শাড়ি দিতে পার সুহাস?

শাড়ি?

হ্যাঁ—এই শাড়িটা আর পরে থাকতে পারছি না।

কিন্তু শাড়ি আমি কোথায় পাবো! জান তো ব্যাচিলর মানুষ—মৃদু হেসে সুহাস জবাব দেয়।

একটা ধুতি—একটা ধুতি দিতে পার না—নেই তোমার সুটকেসে?

তা আছে কিন্তু—

দাও, একটা ধুতিই বের করে দাও।

সুহাস যেন কেমন ইতস্ততঃ করে।

মল্লিকা আবার তাগিদ দেয়, কই দাও—

ধুতি পরবে তুমি?

কেন, ক্ষতি আছে নাকি কিছু?

না—তা নয় তবে—

কি তবে?

মানে বলছিলাম, সধবা মানুষ তুমি—

মৃদু হাসে মল্লিকা প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দে।

হাসছো যে?

না—কিছু না।

মলি—

এই হাতে শাঁখা, মাথায় সিঁদুর দেখে ঐ কথাটা তোমার মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি—কিন্তু—মল্লিকা বলতে গিয়েও কিছু যেন তারপর

বলতে পারে না।

মুহূর্তকাল চুপ করে থাকে, তারপর বলে, ও সব কিছু না—

কিছু না মানে?

মূলেই যার প্রতারণা আর মিথ্যা—তার স্বীকৃতি নিয়ে মাথা ঘামানোর মত মিথ্যা বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে বলতে পার সুহাস—দাও, একটা ধুতি দাও—সমস্ত শরীর যেন আমার জ্বলছে—

সুহাস অগত্যা উঠে উপরের বাংক থেকে সুটকেসটা নামিয়ে একটা সরু পাড় ধুতি বের করে, কিন্তু তবু যেন মল্লিকার হাতে তুলে দিতে পারে না।

মল্লিকাই সুহাসের হাত থেকে ধুতিটা টেনে নেয় এবং সোজা টয়লেটের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে দরজাটা আটকে দেয় ভিতর থেকে।

॥ ৬ ॥

টয়লেটের মধ্যে ঢুকে মল্লিকা প্রথমেই পরিধেয় দামী বেনারসী শাড়িটা গা থেকে খুলে ফেলে।

ধুতিটা পরে নেয়।

তারপর গা থেকে একে একে গহনাগুলো খুলে ফেলে।

সিঁথি-মৌরটা মাথা থেকে খুলতে গিয়ে হঠাৎ পিছনের চুলে হাত পড়তেই কি যেন একটা শক্ত হাতে ঠেকে।

টান দিয়ে সেটা খুলে আনে।

সোনার কাজললতাটা।

সঙ্গে সঙ্গে যেন মনের পাতা জুড়ে ভেসে ওঠে দু'রাত্রির আগের সেই দৃশ্যটা।

বিবাহের পর বাসর-ঘরে ঢুকে অসিত তার হাতের ঐ সোনার কাজললতাটা দিয়েই ওর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিল। সোনার কাজললতা দিয়ে বিবাহের রাত্রে নববধূর সিঁথিতে সিঁদুর পরানোই

নাকি ওদের বংশের রীতি।

ওর প্রপিতামহ প্রপিতামহীকে—পিতামহ পিতামহীকে—বাবা তার মাকে—ঐ সোনার কাজললতা দিয়েই সিঁন্দুর পরিয়ে দিয়েছিল।

তারপর কাজললতাটা মল্লিকার হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা খোঁপায় গুঁজে রাখ—পাঁচদিন পরে আবার মাকে দিয়ে দিও—মা বলে দিয়েছে—

মল্লিকাও খোঁপায় গুঁজে রেখেছিল কাজললতাটা।

মনেই ছিল না কথাটা।

এই কাজললতা দিয়েই তার সিঁথিতে সিঁন্দুর পরিয়ে দিয়েছে অসিত।

তার বিবাহের স্বাক্ষর—তার এয়োতির চিহ্ন।

তাড়াতাড়ি পরিধেয় বস্ত্রের আঁচলটা তুলে ঘষে ঘষে মাথার সিঁথির সিঁন্দুর মুছে ফেলে মল্লিকা।

উঃ বুকের ভিতরটা যেন জ্বলে একেবারে খাক হয়ে যাচ্ছে!

একটা বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদ—

প্রতারণা করে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।

ভেবেছিল কি ভবানী দেবী! কৌশলে কোনমতে একবার বিয়েটা দিয়ে দিলেই তারা সেটা মেনে নেবে?

একটা উন্মাদকে চিরজীবনের মত স্বামী বলে গ্রহণ করে নেবে?

সহজে নিষ্কৃতি দেবে নাকি মল্লিকা ঐ ভবানী দেবীকে! আদালতের কাঠগড়ায় নিয়ে গিয়ে তাকে তুলবে মল্লিকা।

ঐ—ঐ ভদ্রমহিলা—প্রতারণা করে তার উন্মাদ ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছে!

বলুন—আপনারাই বলুন ওর ফাঁসী কিম্বা সারা জীবন জেল হওয়া উচিত কিনা!

শাঁখাটা—

প্রথমে হাতের শাঁখা টেনে খুলে ফেলবার চেষ্টা করে মল্লিকা কিন্তু পারে না—ঘৃণায় আক্রোশে যেন উন্মাদের মতই শাঁখা পরা হাত দুটো তখন ওয়াশিং বেসিনের উপরে ঠোকে—গুঁড়িয়ে যায় শাঁখা দুটো।

টুকরো টুকরো হয়ে টয়লেটের মেঝেতে পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু ওকি—সামনের আশাতে নিজের প্রতিবিম্বটা দেখে মল্লিকার মনে হয়, সিঁথির সিঁন্দুর তো একেবারে মুছে যায়নি এখনো—

আবার শাড়ির আঁচলটা তুলে ঘষতে গিয়ে হঠাৎ যেন তার হাতটা থেমে নিশ্চল হয়ে যায়। শাঁখা ভাঙ্গতে গিয়ে বোধ হয় হাতটা কেটে গিয়েছিল—ডান হাতের কব্জির কাছ থেকে লাল একটা রক্তের ধারা নেমে এসেছে—

সেই লাল রক্তের ধারাটার দিকে কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মল্লিকা। সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে ভেসে ওঠে একখানি মুখ।

দুটো বড় বড় চোখের কেমন যেন ভীরু সরল চাউনি। সে দুটি চোখের দৃষ্টি নির্নিমেষে তারই মুখের দিকে চেয়ে আছে।

সোনার কাজললতাটা দিয়ে তার সিঁথিতে সিঁন্দুর পরিয়ে দিয়ে চেয়ে আছে।

পারে না।

মুছতে পারে না আর, মোছা হয় না তখনো সিঁথিতে যে সিঁন্দুরের রক্তিম শেষ চিহ্নটুকু রয়ে গিয়েছে সেই চিহ্নটুকু! যা মুছেও মোছেনি—মুছে ফেলতে পারেনি মল্লিকা!

চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছিল।

অসিত ততক্ষণে শুয়ে পড়েছিল। বোধ হয় ঘুম পেয়েছিল।

অসিতের দিকে ফিরে যখন আবার তাকিয়েছিল মল্লিকা, দেখেছিল বালিশে মাথা রেখে অসিত শুয়ে—চোখ দুটো বোজা।

মল্লিকা ভেবেছিল অসিত আরো হয়ত কথা বলবে তার সঙ্গে।

কতটুকুই বা আর রাত বাকী আছে—বাকী রাতটুকু হয়ত কথা বলতে বলতেই কেটে যাবে।

আশ্চর্য!

তখন তো একবারও মনে হয়নি মল্লিকার মানুষটা পাগল—একটা বদ্ধ উন্মাদ!

অবিশ্যি অদ্ভুত চুপচাপ মনে হয়েছিল মানুষটাকে—অত্যন্ত যেন শান্ত ধীর। কি অসহায় সরল দুটি চোখের চাউনি।

সেই মানুষটাই—

আবার যেন সমস্ত স্মৃতি তোলপাড় করে ওঠে। একটা ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয় মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

অসহ্য একটা যন্ত্রণায় যেন টন টন করতে থাকে সমস্ত মাথাটা। মনে হয় বুঝি কেউ ছুঁচ বিঁধোচ্ছে।

না—ঐ দুঃসহ স্মৃতি যত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায়, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলা যায় ততই ভাল।

তবু ভাল—পাগলটা তার শরীরটাকেও নষ্ট করে দেয়নি। ইচ্ছা করলেই তা পারত—সে তো বাধা দিতে পারত না—জীবনের সর্বাপেক্ষা এক স্বাভাবিক ঘটনা বলে।

কিম্বা আর দু'দিন পরেও তো ওর পাগলামিটা প্রকাশ পেতে পারত।

এতক্ষণে হয়ত ভবানী দেবী জানতে পেরে গিয়েছে সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। খুঁজবেন নিশ্চয়ই তাকে কিন্তু জানাজানি হবার ভয়ে চুপি চুপি—গোপনে কাজ সারতে হবে তাঁকে।

সত্যি আশ্চর্য মহিলাটি!

অত বড় একটা ঘটনার পরও কিনা তাকে আরো দুটো রাত থাকবার জন্য অনুরোধ জানাতে দ্বিধা বোধ করলেন না।

যেন তাঁর ইজ্জত আর সম্মানটাই সব।

আর মল্লিকার সঙ্গে যে এতবড় মিথ্যাচরণ—এতবড় প্রতারণা করলেন সেটার কথা তার মনেই হলো না একটিবার।

তার নিজের মিথ্যা আর প্রবঞ্চনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই তাঁর যত ব্যাকুলতা।

মল্লিকা বেনারসী শাড়ি ও গহনাগুলো সব একটা পুঁটলি করে বাঁধে—তারপর টয়লেটের দরজা খুলে বের হয়ে আসে টয়লেট থেকে।

সুহাস বসে বসে একটা সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করে টানছিল।

মল্লিকার পদশব্দে ফিরে তাকালো।

মল্লিকার গৌরবর্ণ ছিপছিপে দেহে সাদা ধবধবে ধুতিটা যেন কেমন বিষণ্ণ করুণ মনে হয়।

দেহ থেকে সমস্ত অলঙ্কার সে খুলে ফেলেছে।

কেবল দু হাতে তার বাপের দেওয়া চিরদিনের কঙ্কণ জোড়া ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। ভিজা চুলের দু-একটা কপালের ওপরে এসে পড়েছে ঘোমটার ফাঁকে।

ভেলটা দিয়ে একটা পুঁটলি বাঁধা। পুঁটলিটা পাশে বার্থের উপর নামিয়ে রেখে মল্লিকা বসল।

মল্লিকার ঐ অপূর্ব বেশের দিকে তাকিয়ে সুহাস যেন হঠাৎ চমকে ওঠে।

সম্পূর্ণ নিরাভরণা—করুণ—বিষণ্ণ।

কয়েকটা মুহূর্ত ঐ করুণ বিষণ্ণ মূর্তির দিকে চেয়ে থেকে সুহাস বলে, এ কি—

মল্লিকা সুহাসের দিকে তাকাল।

কি? মৃদুকণ্ঠে বলে মল্লিকা।

সমস্ত গহনা তোমার কোথায়?

খুলে ফেলেছি—

খুলে ফেলেছো?

হ্যাঁ—খুলে ফেললাম।

কিন্তু কেন?

ও যাদের জিনিস তাদের পাঠিয়ে দেবো বলে।

কথাগুলো বলতে বলতে মল্লিকা মুখোমুখি এসে বসল।

যাদের জিনিস—

হ্যাঁ—পাঠিয়ে দেবো বলে খুলে ফেললাম। এই শাড়িটার মধ্যে সব রয়েছে। তোমার সুটকেসে রেখে দাও এখন।

শাড়ি ও গহনাগুলো এগিয়ে দিল মল্লিকা সুহাসের দিকে।

সুহাস কেমন যেন বিব্রত বোধ করে নিজেকে।

কি হল ধর—রেখে দাও এগুলো তোমার সুটকেসটার মধ্যে?

সুহাস তথাপি নিশ্চুপ, নিষ্ক্রিয়।

মল্লিকাই তখন উঠে গিয়ে সুহাসের সুটকেসের মধ্যে গহনাগুলো ও

শাড়িটা রেখে ডালাটা আবার বন্ধ করে দিল।

ইতিমধ্যে একটা জংশনে এসে ট্রেনটা থেমেছিল।

সুহাস চায়ের অর্ডার দিয়েছিল—

বেয়ারা এসে ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম কামরার মধ্যে রেখে গিয়েছিল—

সেই দিকে নজর পড়ায় মল্লিকা শুধায়, চা খেয়েছো তুমি ?

না—

খাবে না ?

হ্যাঁ—

মল্লিকা ট্রেটা টেনে নিয়ে চা তৈরী করতে বসে। অত্যন্ত স্বাভাবিক যেন সে—যেন তার কিছুই হয় নি। একসঙ্গে এক কামরায় দুজনে কোথায় বেড়াতে চলেছে।

সত্যি সুহাস, ভগবানই তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন এ সময়—চায়ের কাপে চিনি দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে।

সুহাস কি বলবে বুঝতে পারে না।

পূর্ববৎ চুপ করেই থাকে।

মল্লিকা একটা কাপ সুহাসকে এগিয়ে দিয়ে অন্যটা নিজে তুলে নিল হাতে।

ধীরে ধীরে গরম চায়ে চুমুক দিতে থাকে।

মলি !

কিছু বলছো ?

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

কি বুঝতে পারছো না ?

গোড়া থেকেই সব ব্যাপারটা কেমন যেন আমার লাগছে—হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে মাঝরাত্রে ট্রেনে অমন করে একা একা এসে উঠলে ! শাড়িটা ও গহনা-টহনাগুলো সব গা থেকে খুলেই বা ফেললে কেন ?

কারণ ফিরিয়ে দিতে হবে বলে—

ফিরিয়ে দিতে হবে ?

হ্যাঁ, কারণ ওগুলো যাদের দেওয়া, তাদের সঙ্গে যখন আর আমার কোন সম্পর্কই থাকল না, তখন ওগুলো গায়ে রাখবো কেন? তাই খুলে ফেললাম—

সম্পর্ক থাকল না!

না—

কার সঙ্গে সম্পর্ক থাকল না! কি বলছো তুমি মলি—

ঠিকই বলছি—একদল ইতর নীচ প্রবঞ্চক—হঠাৎ যেন জ্বলে ওঠে আবার মল্লিকা।

তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না মলি—তুমি কি তোমার শ্বশুরবাড়ির কথা বলছো—

তবে—আর কাদের কথা বলব!

একটা প্রশ্ন সুহাসের গলার কাছে এসে ঠেলাঠেলি করছিল—সেটাই বের হয়ে আসে।

তবে তুমি কি শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এলে নাকি?

পালিয়ে আসব কেন?

তবে?

বলেই এসেছি। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়ে এসেছি কোন সম্পর্কই আর অতঃপর তাদের সঙ্গে আমার রইলো না।

সম্পর্ক রইলো না?

না।

মলি, please আমাকে সব কথা খুলে বল—

কি বলবো!

তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে এলে মানে কি? কোন কিছু এমন কি ঘটেছে—তোমার শাশুড়ী বা স্বামী—

স্বামী! করুণ একটুখানি হাসি মল্লিকার ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে উঠেই আবার মিলিয়ে যায়।

মল্লিকার চোখের তারা দুটো যেন সহসা আবার জ্বলে ওঠে।

জান সুহাস, ওরা আমাকে—আমার শিবের মত বাবাকে ঠকিয়েছে!

কি বলছো তুমি?

যা বলছি তার একবর্ণও মিথ্যা নয়।

কথাগুলো মল্লিকা শেষ করতে পারে না।

তার দু চোখের কোল দুটো অকস্মাৎ যেন ছল ছল করে ওঠে।

যে বেদনা যে বিক্ষোভ যে লজ্জা ও অপমান তার সমস্ত মনকে এতক্ষণ তোলপাড় করছিল—সেটা যেন আর চেপে রাখতে পারে না মল্লিকা।

চোখের জলের ভিতর দিয়ে সেটা যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা আবার নিজেকে সামলে নেয়। সজোরে নিজের ঠোঁটটা নিজেই কামড়ে ধরে।

সুহাস চেয়ে থাকে মল্লিকার মুখের দিকে।

মলি!

কি?

কি হয়েছে মলি আমাকে বল—

কি বলবো—কি শুনবেই বা তুমি—

তারপর একটু থেমে বলে, আমার কথা থাক—কিন্তু তুমি এদিকে এ সময় কোথা থেকে?

আমি ঐদিকে গিয়েছিলাম—আমার এক বন্ধুর খুব অসুখের সংবাদ পেয়ে তাকে দেখতে।

আচ্ছা সুহাস?

বল।

আচ্ছা সুহাস, তুমি অতদিন পরে বিলেত থেকে লক্ষ্ণৌ ফিরে এসে আমার সঙ্গে একবার দেখাও করলে না—একেবারে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চলে এলে!

কে বললে দেখা না করে চলে এসেছিলাম? মৃদু হেসে সুহাস বলে, দেখা করবো বলেই তো লক্ষ্ণৌয়ে পৌঁছে পরের দিন সকালেই তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম দেখা করতে—

বিকেলে বাড়ি ফিরে এসে বাবার মুখে তোমার কথা শুনে তারপর

ছুটো দিন বাড়ি থেকে বের হয়নি পর্যন্ত—তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি—তুমি বলে গিয়েছিলে বাবার কাছে আবার আসবে তাই—

লক্ষ্ণৌয়ে তো থাকব বলে যাইনি—

তবে ?

তোমার সঙ্গে দেখা করতেই গিয়েছিলাম—হোটেলে ফিরে এসে দেখি কলকাতার কলেজের ইণ্টারভিউর লেটারটা এসে গিয়েছে। পরের দিনই তাই রওনা হয়ে পড়ি—

এখন তুমি কোথায় আছো ?

কলকাতায়।

লক্ষ্ণৌয়ে আর ফিরবে না ?

কি হবে আর ফিরে—

তুমি কিন্তু বলেছিলে বিলেত থেকে ফিরে এসে লক্ষ্ণৌতেই প্র্যাক্‌টিস করবে—তা হঠাৎ মত বদলে গেল যে ?

সুহাস প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসলো। তারপর একটু থেমে মৃদুস্বরে বললে, তোমার বাবার মুখে শুনেছিলাম মস্তবড় ধনীর বাড়িতে তোমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে—একমাত্র ছেলে—তা কবে বিয়ে হলো ?

এবার মল্লিকাই চুপ করে যায়।

তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে না! আমার কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ করবার খুব ইচ্ছা—

কার সঙ্গে আলাপ করবে—সে কি একটা মানুষ নাকি !

তার মানে—কি বলছো তুমি ?

ঠিকই বলছি—

মলি !

উঁ—

তোমার স্বামী একজন প্রফেসর, না ?

কি জানি—জানি না।

হঠাৎ মল্লিকা চুপ করে গেল।

ট্রেনের গতি ক্রমশঃ কমে আসছে।

বোধ হয় রানাঘাট এলো।

সুহাস!

কিছু বলছিলে?

আজ রাত্রের ট্রেনেই লক্ষ্ণৌ চলে যেতে চাই—

মলি, আমাকে সব কথা খুলে বল লক্ষ্মীটি!

কি বলব সুহাস? কিছু বলবার নেই আর—ওরা—ওরা আমাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে। অসিত, মানে ওদের ছেলে, সে পাগল—

বল কি!

তাই সুহাস, ব্যাপারটা যতই ভাবছি তখন থেকে মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলা কি করে একাজ করলেন—করতে পারলেন সব জেনেশুনেও—

আমি সত্যিই তোমার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না মলি—please আমাকে সব কথা খুলে বল।

কি বলব? বলবার আর কিছুই নেই সুহাস। একটা জঘন্য প্রতারণা—একটা মিথ্যা—মল্লিকা আর বলতে পারে না।

গলাটা যেন তার ধরে আসে।

মল্লিকা মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। সুহাসের যেন মনে হয় মল্লিকা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে প্রাণপণে নিজেকে রোধ করবার চেষ্টা করছে।

মলি আমি বুঝতে পারছি কোথাও একটা বিশ্রী গোলযোগ ঘটেছে। তারপরই একটু থেমে বলে, তুমি কি তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকেই চলে এলে নাকি?

হ্যাঁ—

পালিয়ে নয়ত?

পালিয়ে আসব কেন—স্পষ্ট মুখের উপরে জানিয়েই চলে এসেছি—জান সুহাস ওরা আমার শিবের মত বাবার সঙ্গে জঘন্য প্রতারণা করেছে—

প্রতারণা!

তাছাড়া কি—একটা পাগল উন্মাদ—

উন্মাদ! কে? কার কথা বলছো?

অসিত—যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে দুদিন আগে—

কি বলছো মলি—

তাই। বদ্ধ পাগল একটা।

তুমি বলতে চাও তোমার স্বামী অসিতবাবু—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—উঃ এখনো যেন আমি ব্যাপারটা ভাবতে পারছি না। জান সুহাস—আজ ছিল ফুলশয্যা—বসে বসে অপেক্ষা করতে করতে কখন বোধহয় ঘুম এসে গিয়েছে, হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে দেখি—সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে—আর তার চোখে এক অস্বাভাবিক দৃষ্টি—

তারপর—

তার পর আর কি হঠাৎ ছুটে এলো আমার গলা টিপে ধরবার জন্য—সব ছিঁড়েখুঁড়ে ছত্রাখান করে দিতে লাগল—ভাগ্যিস আমার চিৎকার শুনে সবাই এসে পড়েছিল—নচেৎ পাগলটা হয়ত আমাকে শেষই করে ফেলত।

আমি সত্যিই যেন তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না মলি—একটা পাগলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে! ওদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু তোমার বাবা, মেসোমশাই তিনি একাজ করলেন কি করে? তিনিও কি বিয়ের আগে ভাল করে ছেলে সম্পর্কে খোঁজখবর নেন নি?

এখন আমার কি মনে হচ্ছে জান সুহাস—

কি?

সমস্ত কিছুর পিছনে বিরাট কুৎসিত একটা ষড়যন্ত্র ছিল—

ষড়যন্ত্র!

হ্যাঁ—

মল্লিকা অতঃপর তার বিয়ের ব্যাপারটা সংক্ষেপে সুহাসের কাছে বলে যায়। এবং শেষে বলে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখো—আসল সত্যটা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই ছেলের মার প্রথম থেকেই এত সাবধানতার প্রয়োজন হয়েছিল—

সুহাস কি বলবে বুঝতে পারে না।

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে গিয়েছিল।

সুহাসই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে, চলে এসেছো ভালই করেছো তুমি। কিন্তু—

মল্লিকা বলে, আজই রাত্রের গাড়িতে আমি লক্ষ্ণৌ ফিরে যাবো—

লক্ষ্ণৌ!

হ্যাঁ—এত সহজে মা আর ছেলেকে আমরা ছেড়ে দেবো নাকি! বাবাকে বলবো ওদের নামে আদালতে কেস করতে—

আমার কিন্তু মনে হয় হঠাৎ একটা কিছু না করাই ভাল—

তার মানে!

একটা কথা ভেবে দেখো মলি, তোমার বাবা যখন ছেলেকে দেখতে যান তখন এবং বিয়ের রাত্রেও তুমি অসিতবাবুর মধ্যে কোন abnormality দেখো নি—he was quite normal—সুস্থ—স্বাভাবিক—হঠাৎ সে ফুলশয্যার রাত্রে অমন হয়ে গেল কেন—

কি বলতে চাও তুমি সুহাস?

বলতে আমি এই চাই যে অসিতের ব্যাপারটার ভিতরে নিশ্চয়ই কোথাও একটা কিছু আছে—বা ছিল সেটা হয়ত তার মা মানে তোমার শাশুড়ী ভবানী দেবীও জানতেন না—

জানতেন না তিনি তুমি বলতে চাও—

হ্যাঁ—কারণ সত্যিই কোন মা তার পাগল ছেলের কি এমনি করে বিয়ে দিতে পারেন—আর দেবেনই বা কেন! একদিন না একদিন তো সেটা প্রকাশ হয়ে পড়তই—

না, না—সুহাস তুমি বুঝতে পারছো না। ইচ্ছা করেই তিনি—সব জেনেশুনেই তিনি একাজ করেছেন—

না—আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। দেখ আমি একজন ডাক্তার—মানসিক রোগ সম্পর্কে আমি পড়াশুনাও করেছি এবং

রোগীও অনেক দেখেছি—শোন মলি আমার মনে হয় তোমার আজই লক্ষ্ণৌয়ে ফিরে গিয়ে মেসোমশাইকে সব কথা বলা এখনই উচিত হবে না—

তার মানে! কি তুমি বলতে চাও—

তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি একবার তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি—তাঁর মুখ থেকে সব শুনলে—

যেতে হয় তুমি যেতে পার—আর এই তাঁদের শাড়ি-গহনাগুলোও তাদের পৌঁছে দেওয়া দরকার—কিন্তু আমি আজই লক্ষ্ণৌ যাবো—

শাড়ি গহনা আমি পৌঁছে দেবোখন—কিন্তু তুমি বরং দুটো দিন আমার কলকাতার বাসায় থাক—

না—আমাকে আজই লক্ষ্ণৌ ফিরে যেতে হবে—

দেখো মলি এতবড় একটা ব্যাপারের নিষ্পত্তি এত সহজে হতে পারে না।

তাই বলে একটা পাগলকে স্বামী বলে মেনে নিতে হবে নাকি আমাকে!

তা তো আমি বলিনি—কেবল বলেছি আমার ফিরে আসা পর্যন্ত—

না—

মল্লিকা সুহাসের কোন কথাই শুনলো না।

কোন যুক্তিই মানতে চাইল না।

ঐ দিনই রাত্রে পাঞ্জাব মেলে সে উঠে বসল লক্ষ্ণৌ যাবার জন্য। যাবার সময় অসিতের ঠিকানা দিয়ে শাড়ি ও গহনাগুলো সেখানে পৌঁছে দেবার জন্য আর একবার অনুরোধ জানিয়ে গেল।

একটা ছোট্ট চিঠিও ঐ সঙ্গে লিখে দিয়েছিল মল্লিকা ভবানী দেবীর নামে সুহাসের হাতে—

আপনার দেওয়া গহনাগুলো ফেরত পাঠালাম—

ইতি—মল্লিকা।

বেলা তখন আটটা সাড়ে আটটা হবে।

মহেন্দ্রনাথ তানপুরাটা নিয়ে দোতলায় নিজের ঘরটিতে মেঝের ওপরে বসে চোখ বুজে আপন মনে ভৈরো রাগ আলাপ করছিলেন।

খুব প্রত্যুষে বরাবর শয্যাত্যাগের অভ্যাস মহেন্দ্রনাথের। এবং কি শীত কি গ্রীষ্ম ঐ ভোরেই স্নান ইত্যাদি সমাপন করে তানপুরাটা নিয়ে বসতেন রেওয়াজ করতে।

বেলা দশটা পর্যন্ত চলত একটানা রেওয়াজ। কখনো কখনো বেলা আরো গড়িয়ে যেতো।

মল্লিকাকে এসেই তখন বাধ্য হয়ে তাগিদ দিতে হতো।

বাবা—

কি মা?

আজ কি আর উঠবে না? খাওয়া-দাওয়া হবে না—

এইবার উঠবো।

কিন্তু মল্লিকা শুনতো না। হাত ধরে সুরপাগল বাপকে টেনে তুলতো, না ওঠো—

অগত্যা তানপুরাটা নামিয়ে রেখে উঠতেই হতো মহেন্দ্রনাথকে। কিন্তু মল্লিকার বিয়ের পর কলকাতা থেকে আজ দিন চারেক ফিরে এসেছেন তিনি একাই। আজ আর তাঁকে সে তাগিদ জানাবারও তো কেউ নেই তাই ওঠার কথা মনেই হয় না।

লখিয়ার মা—সেই ছুবেলা রান্না করে দেয়—বাড়িতে মহেন্দ্রনাথকে, দেখাশোনা করবার আজ ঐ একজনই আছে।

আরো একজন অবিশ্যি ছিল মহেন্দ্রনাথের, রজনীকাকা—ওর দাছু। এক জাতও নয়। গ্রাম সম্পর্কে সম্পর্ক নচেৎ কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না মহেন্দ্রনাথের রজনীর সঙ্গে।

মল্লিকা বার বার করে বলে গিয়েছিল শ্বশুর-গৃহে যাত্রার পূর্বে লখিয়ার মাকে, দাছু আছেন বটে তবে তিনিও বুড়ো মানুষ—বাবুজী যেন ঠিক সময় খায় দেখিস লখিয়ার মা—

লখিয়ার মা বলেছিল, চিন্তা করিস না বিটি—আমি যতদিন আছি

কোন চিন্তা নেই।

রিক্শা থেকে নেমে মল্লিকা সিঁড়ি ভেঙ্গে সোজা উপরে উঠে আসে।

ভৈরো আলাপ কানে আসে।

বছরখানেক হল মহেন্দ্রনাথ চোখে ক্রমশই যেন কম দেখছেন।

প্রথমে ভেবেছিলেন বুঝি চোখে ছানি পড়ছে কিন্তু ডাক্তার পরীক্ষা করে এক মর্মান্তিক কথা বললো।

চোখের নার্ভ নাকি ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে মহেন্দ্রনাথের। অপটিক নার্ভ এট্রফি। এবং ক্রমশঃ তাঁর চোখের দৃষ্টি কমতে কমতে, যা ঐ রোগের অবশ্যম্ভাবী, অন্ধ হয়ে যাবেন।

বিলেত যাবার আগে সুহাসই তার এক পরিচিত চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে মহেন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিল।

একবার ভেবেছিল সুহাস কথাটা মল্লিকাকে বলবে, তার পর আবার কি ভেবে কথাটা আর জানায় নি তাকে।

আর জানিয়েই বা কি হবে? ও রোগের যখন কোন আর চিকিৎসাই নেই তখন মিথ্যে আগে থাকতেই ওদের মন ভেঙ্গে দিয়ে—ওদের নিরাশ করে লাভ কি?

মল্লিকা যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মহেন্দ্রনাথ ভাল করে দেখতেই পান নি। তা ছাড়া রেওয়াজ করছিলেন বলে অন্যমনস্কও ছিলেন।

মল্লিকা মৃদুকণ্ঠে ডাকে, বাবা—

প্রথমবারের ডাকটা কানে প্রবেশ করে না মহেন্দ্রনাথের।

দ্বিতীয়বার আবার তাই ডাকে মল্লিকা, বাবা—

কে?

বাবা—

এ কি মঞ্জু-মা—কখন এলি মা?

তাড়াতাড়ি আনন্দে মহেন্দ্রনাথ তানপুরাটা একপাশে নামিয়ে রাখেন।

ওখানে দাঁড়িয়ে কেন রে—আয় আয়—আমার কাছে আয়

মা। আয়—.

মল্লিকা বাপের সামনে এসে বসে।

দু'হাতে মহেন্দ্রনাথ কন্যাকে বুকের মাঝখানে টেনে নেন।

হ্যাঁরে—জামাই বাবুজী কোথায়—তাকে নীচে রেখে এলি বুঝি? দেখ দেখি কি কাণ্ড—ওরে ও লখিয়ার মা—

চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করেন মহেন্দ্রনাথ।

মল্লিকা তাড়াতাড়ি বলে, না বাবা না—আর কেউ আসে নি। আমি একাই এসেছি—

একা এসেছিস? সেকি রে—প্রথমবার যে জোড়ে আসতে হয়—দ্বিরাগমন—বেয়ান ঠাকরুন তোকে একা ছেড়ে দিলেন?—না, না—এ অন্যায়—এ অমঙ্গল—আমি আজই এখুনি জরুরী টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি, তাকে পাঠিয়ে দিতে হবে!

না বাবা, তার পাঠিয়ে কোন লাভ নেই—

মেয়ের গলার স্বরটা যেন এতক্ষণে মহেন্দ্রনাথের কেমন মনে হয়।

হঠাৎ যেন একটা খটকা লাগে।

মেয়ের মুখের দিকে তাকান মহেন্দ্রনাথ।

ডাকেন, মঞ্জু—

বাবা—

কিন্তু মা—

মহেন্দ্রনাথ কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মল্লিকা বাপকে যেন তার অর্ধপথে থামিয়ে দেয়।

বলে, সে কথা থাক বাবা—

রজনীনাথ গৃহে ছিলেন না, বাজারে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেনি ওরা কখন একসময় প্রৌঢ় রজনীনাথ ঐ ঘরে এসে ঢুকেছে বাজার থেকে ফিরে।

ওদের কথা শুনছে।

সাধারণ চেহারার বেঁটেখাটো লোকটি। পরনে একটি ধুতি ও গায়ে একটা কুর্তা।

ছোট ছোট করে কদম ছাট চুল মাথায়।

চোখে নিকেলের ফ্রেমে চশমা।

মহেন্দ্রনাথের দেশেই যদিও বাড়ি রজনীর কিন্তু জাতে কায়স্থ এবং বিশেষ কোন লেখাপড়া কোন দিন শেখেনি।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে একদিন ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্ণৌয়ে মহেন্দ্রনাথের কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং সেই থেকেই মহেন্দ্রনাথের আশ্রয়েই থেকে গিয়েছে বাড়ির একজনের মতই।

মহেন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে-ই সংসারটার হাল ধরে আছে।

মল্লিকাকে একপ্রকার বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছে—মল্লিকাকে নিজের সন্তানের মতই স্নেহ করে রজনীনাথ।

মহেন্দ্রনাথ তাকে রজনীকাকা বলে ডেকে এসেছে বরাবর।

আর রজনী মহেন্দ্রনাথকে মহেন্দ্র ও তার স্ত্রীকে নাম ধরেই ডেকেছে বরাবর।

মহেন্দ্রনাথ আবার বলেন, কিন্তু তার আসা উচিত ছিল মা—এই যে নিয়ম—হিন্দুর অবশ্য পালনীয়, তাছাড়া বেয়ানকেও আমি বলে এসেছিলাম দিন দশেকের মধ্যে জামাই মেয়ে জোড়ে পাঠিয়ে দিতে—

সে আসবে না বাবা—

আসবে না!

না। কোন দিনই আসবে না।

কোন দিনই আসবে না—কি বলছিস মা তুই?

হ্যাঁ বাবা, মল্লিকা শান্ত গলায় এবারে জবাব দেয়, আর আমিও চিরদিনের মত সেখান থেকে চলে এসেছি—

চিরদিনের মত চলে এসেছিস?

কেমন যেন অসহায়ের মতই মল্লিকার উচ্চারিত কথাটা পুনরোচ্চারণ করলেন মহেন্দ্রনাথ।

মল্লিকা এবারে বলে, হ্যাঁ—তারা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বাবা।

প্রতারণা করেছে! কে—কারা—

আমার শাশুড়ী—

সেকি—না, না—এ তুই কি বলছিস মা!

ইতর—ছোটলোক—

না, না—হতেই পরে না। তাঁকে যতটুকু জেনেছি যেটুকু তাঁর পরিচয় পেয়েছি—

কোন পরিচয়ই পাও নি—কিছুই তার সম্পর্কে তুমি জানতে পারনি। মল্লিকার গলায় যেন একটা স্পষ্ট বিরক্তির সুর, সব তারা গোপন করেছে—

গোপন করেছে!

হ্যাঁ—সত্য গোপন করে—ছলনার আশ্রয় নিয়ে—

ছলনার আশ্রয় নিয়ে!

হ্যাঁ বাবা—অসিত সুস্থ নয়—

অসিত সুস্থ নয়!

না—বিকৃত-মস্তিষ্ক—পাগল একটা ঘোর উন্মাদ—

মনু—

একটা অস্পষ্ট চিৎকার যেন বের হয়ে আসে নিজের অজ্ঞাতেই মহেন্দ্রনাথের কণ্ঠ দিয়ে।

॥ ৮ ॥

অতঃপর নিদারুণ এবং অতর্কিত একটা মানসিক আঘাতে মানুষ যেমন হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য কেমন বোবা বিমূঢ় হয়ে যায়, মহেন্দ্রনাথও যেন তেমনি হয়ে যান ক্ষণপূর্বের মল্লিকার মুখোচ্চারিত কথাটা শুনে।

কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে একটা সামান্য শব্দও যেন উচ্চারিত হয় না। এবং ঐভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর যেন কতকটা আত্মগত প্রশ্নের মতই মহেন্দ্রনাথের কণ্ঠ হতে অস্পষ্ট

পুনরোচ্চারিত হয় মল্লিকারই কথাগুলো, পাগল, একটা ঘোর উন্মাদ—না, না—

হ্যাঁ বাবা—ঘোর উন্মাদ—

সব কিছু যেন আমার কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মা—অসিত পাগল—উন্মাদ—এ যে কেমন অবিশ্বাস্য—

অবিশ্বাস্য হলেও বাবা সত্যি—আর এ কাজ তারা জেনেশুনেই করেছে। জেনেশুনেই তারা তাদের পাগল ছেলের বিয়ে দিয়েছে,—

কিন্তু সত্যি সত্যিই যে সে পাগল কেমন করে তুই জানলি ?

এতক্ষণে রজনী কথা বলে এবং রজনীর কণ্ঠস্বরে মল্লিকা ফিরে তাকায়, জানলাম কেমন করে মানে—পাগল না হলে কেউ গলা টিপে মারতে আসে দাদু !

গলা টিপে মারতে এসেছিল—কাকে ?

কাকে আবার, আমাকে—ফুলের মালাগুলো টেনে টেনে ছিঁড়েছে, চোখে অস্বাভাবিক খুনে দৃষ্টি—ভাগ্যে ওর পিসতুত বোন ও করালীচরণ আমার চিৎকার শুনে ঘরে ছুটে এসেছিল নচেৎ আমাকে হয়তো শেষ করেই দিত, তারাই তো কোনমতে টেনেহিঁচড়ে শেষ পর্যন্ত ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় পাগলটাকে—

অসিত পাগল ! ভদ্রমহিলা জেনেশুনে একাজ করলেন ?

মহেন্দ্রনাথই আবার কথাটা বলেন।

হ্যাঁ বাবা, আর সেই জন্যই এখন বুঝতে পারছো তো সমস্ত বিয়ের ব্যাপারটা অমন করে চুপে চুপে কোন প্রকার আড়ম্বর না করে—শেষ করেছেন তিনি—

সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বল মল্লিকা—বিয়ের আগে যখন মহেন্দ্র অসিতকে দেখতে যান তখন এবং বিয়ের সময় তখনও কিছুই বোঝা যায়নি—রজনীনাথ বলেন।

যাও না এখন গিয়ে দেখে এসো ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে দিয়েছে—একটা জন্তুর মত চেঁচাচ্ছে—

আশ্চর্য ! সব জেনেশুনে একটা পাগলের সঙ্গে এমনি করে

ভবানী দেবী বিয়ে দিলেন ? তাই তো কি হবে এখন কাকা !

কথাগুলো বলে কেমন যেন অসহায়ের মত মহেন্দ্রনাথ তাকালেন রজনীর মুখের দিকে।

মল্লিকা ঐ সময় বলে, এত বড় জঘন্য প্রতারণা—যারা আমাদের সঙ্গে করতে পারে—তাদেরও আমরা সহজে নিষ্কৃতি দেবো না বাবা। আমিও স্পষ্টই জানিয়ে দিয়ে এসেছি তাদের সঙ্গে আর আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ওদের নামে আমরা আদালতে নালিশ করবো বাবা—

নালিশ !

হ্যাঁ—এতবড় প্রতারণা আমরা সহ্য করবো নাকি। কোন মতেই না—আজই তোমার বন্ধু অ্যাড্‌ভোকেট বিপ্রদাসবাবুর কাছে চল—তাঁকে সব কথা বলে—ওদের নামে মামলা রুজু করতে বলবো, ফাঁসী না হলেও ওর দীর্ঘমেয়াদী জেল হবেই। এতবড় একটা অফেন্স—

মহেন্দ্রনাথ কন্যার কথার কোন জবাব দেন না।

কেমন যেন অন্যমনস্ক।

কি বুঝি তিনি ভাবছেন।

প্রতারণা—

ভবানী দেবী তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন !

রজনীনাথ ঐ সময় ধীরে ধীরে বলেন, না রে মঞ্জু—তাড়াহুড়া করে কিছু করা—

কি বলছো তুমি দাছু—

ঠিকই বলছি দিদি। আদালতে গেলেই তো আর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে না। মহেন্দ্র—

কিছু বলছিলে কাকা !

হ্যাঁ—আমি বরং কাল একবার মুর্শিদাবাদ যাই—তার সঙ্গে দেখা করে—

না। কিছুতেই না—তীব্র কণ্ঠে বাধা দিয়ে ওঠে মল্লিকা, তার সঙ্গে আর আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর তাছাড়া সেখানে আমরা যাবোই বা কেন ! আমরা আদালতেই যাবো—তাদের যদি

কিছু বলবার থাকে তো সেখানেই তারা বলবে আর বলবেই বা তারা কি—বলবার তাদের আর আছেই বা কি!

না রে—তা হয় না। সেটা বোধ হয় উচিত হবে না দিদি—রজনীনাথ আবার বলেন।

উচিত হবে না! তাদের সঙ্গে আবার উচিত অনুচিত কি—যারা একজন ভদ্র সরল মানুষের সঙ্গে এতবড় প্রতারণা করতে পারে—ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে এতবড়—না, না—দাদু—এর মধ্যে আর কোন কথা বা কিন্তু নেই—তুমি ওঠো বাবা—এখুনি আমরা বিপ্রদাসবাবুর কাছে যাবো। তিনি যদি শোনেন যে তোমার মেয়ের সঙ্গে—তারা এমন হীন জঘন্য প্রতারণা করেছে—একটা উন্মাদ পাগলের সঙ্গে সব জেনেশুনে—

কিন্তু কথাটা ঐ সঙ্গে তাহলে সারা লক্ষ্ণৌ শহরে রাষ্ট্র হতেও আর বাকী থাকবে না তখন—রজনীনাথ বলেন ।

হোক রাষ্ট্র—জানুক সবাই। আর জানতে তো সকলে একদিন পারবেই—চাপা থাকবে ভেবেছো চিরদিন দাদু এ কথা? আর রাষ্ট্র হলেই বা—এতে আমাদের লজ্জার কি থাকতে পারে, কেউ যদি জঘন্য প্রতারণা করে—এতবড় মিথ্যা—

ঠিক আছে—তবু রজনীনাথ বলেন শান্ত গলায়, তুই এখন ওঠ তো—চল ভিতরে—ট্রেনে এতটা পথ এসেছিস, ক্লান্ত—

না, না—আমি এতটুকু ক্লান্ত নই দাদু। তুমি যদি একবারও জানতে পারতে কথাটা, জানা অবধি বুকের মধ্যে আমার কি আগুন জ্বলছে—কি লজ্জা আর যন্ত্রণায় সর্বক্ষণ দগ্ধাচ্ছি আমি—

বুঝতে পারছি রে সবই—তবু—

পারছো না, পারছো না। কিছুই তুমি বুঝতে পারছো না দাদু। বুঝতে যদি পারতে তো ও কথা বলতে পারতে না। ওঠো না বাবা—ওঠো—চল, এখুনি আমরা যাবো—

মল্লিকা হাত বাড়িয়ে মুহ্যমান বিমূঢ় মহেন্দ্রনাথের একটা হাত ধরে আকর্ষণ করে।

দিদি—আমার কথা শোন—রজনীনাথ আবার বলেন।

না, না—তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না—ওঠো বাবা—চল—মল্লিকা আবার মহেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে, তোমার মেয়ের লজ্জা দুঃখ কি তোমার লজ্জা-দুঃখ নয় বাবা—

এবারে মহেন্দ্রনাথও কেমন যেন বিহ্বল ভাবে উঠে দাঁড়ান।

চল—

রজনী এবার মহেন্দ্রনাথকেই বলে, মহেন্দ্র, তুমিও ওর কথাতেই—

কাকা—

বিহ্বল-বিমূঢ় মহেন্দ্রনাথ কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল করে রজনীর দিকে তাকান।

ভাল করে একটা খোঁজখবর না নিয়ে—

খোঁজখবর—কিসের খোঁজখবর আর তুমি চাও দাদু—যেন বাঘিনীর মতই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মল্লিকা রজনীর দিকে, তুমি কি বুঝবে—বাবার মেয়ে না হয়ে যদি আজ তোমার মেয়ে হতাম আমি তাহলে হয়ত বুঝতে মেয়ের লজ্জায় বাপের বুকে কতখানি লাগে—

মলু—

একটা যেন অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে রজনী বিস্ময়ে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাছাড়া তুমি কে—আমাদের বাপ ও মেয়ের ব্যাপারে তুমি কেন মাথা গলাতে এসেছো—

আঃ মলু—মহেন্দ্রনাথও বুঝি মেয়েকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু মল্লিকা তখন সমস্ত যুক্তিতর্কের বাইরে চলে গিয়েছে বুঝি—গত দুরাত্রি ও দুদিন ধরে সর্বক্ষণ যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তাকে অতিবাহিত করতে হয়েছে—যে লজ্জা ও অপমান তাকে পীড়িত করেছে তাতেই যেন তাকে একেবারে সহ্যের শেষ সীমানায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

মল্লিকা তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে আবার, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কেন এসবের মধ্যে কথা বলতে আস—কি বুঝবে তুমি মেয়ের দুঃখে মেয়ের লজ্জায় বাপের বুকে কতখানি লাগে—

আঃ মলু—

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যেন প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করেন মহেন্দ্রনাথ।

কিন্তু রজনীনাথ, যাকে নিয়ে এত কাণ্ড—তার ব্যবহারে বা কণ্ঠস্বরে এতটুকু ক্রোধ বা আক্রোশ যেন প্রকাশ পায় না।

বরং অত্যন্ত শান্ত গলায় বলে, ও তো মিথ্যা বলেনি মহেন্দ্র— তাছাড়া ওর ও কথায় এতটুকুও আমি দুঃখ পাইনি। কিন্তু মল্লিকা, আমি যদি বলি আদালতে যাবার পর যদি প্রশ্ন ওঠে কিম্বা কোনমতে কথাটা প্রকাশ হয়ে যায় যে আমরাও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি—

মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি—

রজনীনাথকে কথাগুলো বলবার সঙ্গে সঙ্গেই মল্লিকা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল—বুঝতে পেরেছিল রাগের মাথায় হঠাৎ যা সে বলে ফেলেছে সেটা তার বলা আদপেই উচিত হয়নি। এখন রজনীর মুখে ঐ কথাটা শুনে মল্লিকা যেন কেমন বিহ্বল ভাবে বলে ওঠে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি—

হ্যাঁ—মিথ্যার আশ্রয়ই নিয়েছি—কারণ আজ পর্যন্ত না প্রকাশ পেলেও আদালতে প্রকাশ পেতেও পারে বা ওরাই কেউ কথাটা জেনে ফেলে আদালতে তুলতে পারে যে তুমিও মহেন্দ্রর মেয়ে নও—

কি—কি বললে ?

ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল কণ্ঠে যেন চিৎকার করে ওঠে মল্লিকা।

হ্যাঁ মল্লিকা—যে মিথ্যার প্রতারণার অভিযোগ ওদের বিরুদ্ধে আনবার জন্য তুমি আদালতে ছুটে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছো, সে মিথ্যা ও প্রতারণার অভিযোগ তারাও তখন আমাদের বিরুদ্ধে আনতে পারে—কারণ তুমি মহেন্দ্রনাথের মেয়ে নও—

আমি আমার বাবার মেয়ে নই—এসব আমি কি শুনছি বাবা— এসব দাদু কি বলছে ?

মল্লিকা স্তব্ধ বিমূঢ় মহেন্দ্রনাথের দুটো হাত এসে দুহাতে চেপে ধরে।

মহেন্দ্রনাথ নির্বাক—যেন পাথর।

হ্যাঁ। মল্লিকা—আমি বলছি তুমি সত্যিই ওর মেয়ে নও—

বল বাবা বল—সত্যিই আমি তোমার মেয়ে নই! চুপ করে আছো কেন বাবা—বল না—

মহেন্দ্রনাথ যেন বোবা।

বল বাবা—

মল্লু—ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকেন মহেন্দ্রনাথ।

না, না বল—দাদু যা বলছে—তা কি সত্যি?

তুই আমারই মেয়ে মা—আমারই মেয়ে তুই—

সত্যি কথাটা আর চেপে রেখে লাভ নেই মহেন্দ্র—ওকে জানতে দাও—রজনীনাথ বলে ওঠে।

॥ ৯ ॥

কিন্তু কেমন করে আজ সে কথা এতকাল পরে বলবেন মহেন্দ্রনাথ মল্লিকার কাছে!

সে লজ্জার কথা, সে পাপের কথা—

কিন্তু মহেন্দ্রনাথ মুখে যতই বলুন যে মল্লিকা তাঁরই মেয়ে—তবু তাঁর গলার স্বরে যেন সে সত্যটা তেমন করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

নিঃসংশয়ে সত্য বলে যা প্রমাণিত হতে পারে।

মল্লিকা তখন বলছে, আমি যদি তোমার মেয়ে নই তো—কার মেয়ে আমি। কে আমার বাবা—কে আমার মা—

কি বলবেন আজ মহেন্দ্রনাথ, কি জবাব দেবেন ঐ প্রশ্নের?

মহেন্দ্রনাথ পাথর—

মহেন্দ্রনাথ বোবা।

মল্লিকা বলে চলেছে, তাহলে সবই মিথ্যা—আমার পরিচয় আমার সম্প্রদান—আমার বিয়ে—সব, সব কিছু আমার মিথ্যা—

মল্লু—শোন মা—

মহেন্দ্রনাথ মেয়েকে ডাকেন—

হ্যাঁ—শুনবো। শুনবো আমি—বল তুমি যদি আমার বাপ নও তো কে আমার বাবা—কার মেয়ে আমি—কেনই বা আমার সত্য পরিচয়টা আমাকে এতদিন জানতে দাওনি—

মলু—

বল, তুমি বল। আর কোন মিথ্যা বা প্রতারণার কথাতেই আমার কোন ভয় নেই—মল্লিকা জবাবে বলে।

মহেন্দ্রনাথ যেন কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে রজনীর মুখের দিকে তাকান।

রজনী বলে, আমি বলছি, শোন ওর শালীর মেয়ে তুমি মল্লিকা—

শালীর মেয়ে!

হ্যাঁ—ওর স্ত্রীর ছোট বোন রাধার—

কি—কি বললে—মার যে অবিবাহিতা বোন রাধা বাড়ি থেকে এক রাত্রে পালিয়ে গিয়েছিল—যতীন না কে একজনের সঙ্গে—

তুই—তুই সে কথা জানলি কি করে?

অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কোনমতে কথাটা যেন উচ্চারণ করেন মহেন্দ্রনাথ।

একদিন তোমার বাক্স গুছাতে গুছাতে একটা পুরাতন চিঠি পাই—তার দিদির কাছে লেখা চিঠি—তাহলে সেই স্ত্রীলোকটির মেয়ে আমি—আমি—তাহলে—সেই যতীন ও রাধারই সন্তান—যে রাধাকে একদিন নিয়ে পালিয়েছিল কিন্তু বিয়ে করেনি—ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল—রাধা ও যতীনের অবৈধ লালসার ফল তাহলে আজও বেঁচে আছে আর সে আমিই।

মলু—

নাম-গোত্র-পরিচয়হীন একটা জারজ সন্তান—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আর আমি—আমিই কিনা তাদের বলে এলাম—তারা আমাদের সঙ্গে জঘন্য প্রতারণা করেছে—তাদের নামে আদালতে কেস করবো বলে আমি ছুটে এসেছি—কথাগুলো বলতে বলতে গলাটা যেন মল্লিকার বুজে আসে।

ঘৃণায় লজ্জায় ধিক্কারে মাটির সঙ্গে যেন সে মিশে যায়।

কিন্তু তাতে তোর দোষটা কোথায় মা—তোর তো কোন অপরাধ নয়—

মহেন্দ্রনাথ কথাগুলো শেষ করতে পারেন না। তার আগেই মল্লিকা তাঁকে থামিয়ে দেয়। বলে ওঠে, আমার অপরাধ নেই—তাদের সন্তান আমি সেটাই তো আমার সব চাইতে বড় অপরাধ—কিন্তু এ তোমরা কি করলে! এমনি করে নাম-গোত্র-পরিচয়হীন করে—

শোন মা—আমার সব কথা শোন—

মহেন্দ্রনাথ কাকুতিতে ভেঙ্গে পড়েন।

কি আর শুনবো—শুনবার আর কি বাকী রইলো! কিন্তু কোথায় তোমাদের সেই রাধা—তার ঠিকানাটা আমাকে বল—

সে তো নেই—

নেই—

না—তোর জন্মের চারদিন পরেই সে হাসপাতালে মারা যায়—

সে তাহলে বেঁচে নেই ?

না। বুঝতে পেরেছিল বোধহয় বাঁচবে না—তাই হাসপাতালের ডাক্তারকে অনুরোধ করেছিল তার দিদিকে একটা খবর দিতে—বলতে বলতে মহেন্দ্রনাথ একটু থামলেন, ডাক্তারের টেলিগ্রাম পেয়ে যখন বম্বের এক হাসপাতালে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম তার ঘণ্টা-দুই আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল—

বহুদিন ধরে অতীতের যে দুঃখময় স্মৃতি বুকের মধ্যে জমাট বেঁধেছিল আজ সেই স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো উল্টাতে গিয়ে বুঝি মহেন্দ্রনাথের বুকের ভিতরটা টন টন করতে থাকে।

আর সেই যতীন না কে—

যতীন তোর জন্মের দু'মাস আগেই তো তাকে ফেলে পালিয়েছিল। তার চিঠিতেই তো সে কথা সে লিখেছিল—

মল্লিকারও হয়ত মনে পড়ে যায় আজ আবার সেই চিঠিটার কথা।

মহেন্দ্রনাথের পুরাতন একটা বাক্স ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ হাতে ঠেকেছিল তার একটা অনেক দিনের পুরানো খামের চিঠি—

শুধু চিঠিটা হলে হয়ত মল্লিকার কোন কৌতূহল হতো না।

সেই খামের ভিতর থেকে হঠাৎ একটা জীর্ণ লাল সুতোয় বাঁধা সোনার মাদুলী বের হয়ে পড়েছিল—

চিঠির খামের মধ্যে সোনার মাদুলী।

মনে হয়েছিল কে যেন সযতনে রেখে দিয়েছে।

চিঠির উপরে নাম তার মার।

এবং ঠিকানা—কাশীর।

কথায়-কথায়ই একদিন শুনেছিল মল্লিকা একসময় মানে তার জন্মের আগে নাকি বাবা কাশীতে ছিলেন।

তারপর লক্ষ্ণৌয়ে চলে আসেন।

বিশেষ কোন আগ্রহ বা কৌতূহল নয়—এমনিই চিঠিটা খুলেছিল—এবং প্রথম দু'লাইন পড়তে গিয়েই কৌতূহলটা উগ্র হয়ে ওঠে।

ছোট একটা চিঠি।'

সুন্দর ছাঁদের মেয়েলী হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা।

দিদি,

জানি দীর্ঘদিন পরে তোমার কলঙ্কিনী বোন রাধার' এই চিঠিটা পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই ভাববে প্রথমেই মেয়েটা কি নির্লজ্জা—অমন করে সেদিন যে রাতের অন্ধকারে কাউকে কিছু না জানিয়ে বের হয়ে যেতে পারে—আবার কোন্ মুখে এই চিঠি সে লিখতে পারে। তার জবাবে শুধু এই-টুকুই বলছি দিদি যে লজ্জার হাত থেকে সেদিন নিজেকে ও সেই সঙ্গে তোমাদেরও বাঁচাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত যতীনের হাত ধরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তোমাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়কে পিছনে ফেলে তার চাইতেও বেশী লজ্জা থেকে আমারই গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচানোর জন্য। সেই তোমাকেই এই চিঠি না লেখা ছাড়া সত্যিই আর আমার উপায় ছিল না বলেই এই চিঠি লিখছি। যতীন—

কোথায় জানি না—ছ'মাস তার কোন সংবাদ নেই—যতীনের খবরেও আর আমার প্রয়োজন নেই—কিন্তু যে সন্তানকে গর্ভে নিয়ে সেদিন পথে বের হয়েছিলাম—সে সন্তানকে যে কোনো পরিচয়ই আমি দিয়ে যেতে পারলাম না। কুমারী মায়ের সন্তান—কেউ তো তাকে গ্রহণ করবে না।

দিদি তাই এই চিঠি তোমাকে দিচ্ছি—তুমি যদি এ অভাগিনী কুমারী মায়ের সন্তানটিকে আপন সন্তান বলে গ্রহণ করো তো জানবো ওর অভাগিনী মায়েরই নয় ওরও অক্ষয় স্বর্গবাস হলো।

নেবে না দিদি—

তাকে পৃথিবীতে বাঁচবার মত একটু আশ্রয় দেবে না। একটু পরিচয়—

তোমার রাধা।

মহেন্দ্রনাথ মল্লিকার মুখের দিকে তাকালেন।

একটি মাত্র প্রদীপ শিখাকে ঘরের যেন অকস্মাৎ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বুকটার মধ্যে বুঝি কেমন করে ওঠে মহেন্দ্রনাথের।

মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, মলু—সবাই জানে তুই আমারই সন্তান—

কিন্তু সে জানাটা যে কত ঠুনকো—সে তো একটু আগে তোমার রজনীকাকার মুখ দিয়েই প্রকাশ হয়ে পড়লো বাবা। তোমার এত স্নেহ এত গোপনতা দিয়েও কি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে শেষ পর্য্যন্ত ? পারলে না বাবা—তা পারা যায় না।

মলু—

তা হয় না বাবা—তা হয় না। এই আমাকে দিয়েই দেখ না বাবা তোমার দয়ায় আমি কনভেণ্টে মানুষ হয়েছি, ছ'ছুটো পাসও করেছি—বইতেও কত পড়েছি এমন তো কতই হয় ও হচ্ছে তবু কেন আমার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সংসারে আর কিছু না হোক প্রত্যেক মানুষেরই একটা পরিচয়ের দরকার হয়—আর সেটা হচ্ছে তার জন্ম-পরিচয়—কোন

শিক্ষা ও কোন কুসংস্কারের দোহাই পেড়েও বোধহয় সেটাকে অস্বীকার করতে পারা যায় না!

মহেন্দ্রনাথ নিশ্চুপ।

কি বলবেন তিনি যেন বুঝতে পারেন না।

রজনীও যেন কেমন বিহ্বল হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

মল্লিকা রজনীর দিকে এবারে ফিরে তাকাল, তোমাকে অন্যায় কটু কথা বলেছি দাদু—আমাকে ক্ষমা কর।

না দিদি—

তুমি আমাকে আজ আমার জন্মের সত্য বৃত্তান্তটা জানিয়ে যে উপকার করেছো চিরদিন আমার মনে থাকবে।

রজনীর চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে।

কোন জবাব দিতে পারে না সে।

আর তুমিও আমাকে ক্ষমা করো বাবা—মহেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে তাকিয়ে এবারে বলে মল্লিকা, জন্মদাতা আমার যেই হোক, জ্ঞান হওয়া অবধি তোমাকে বাবা বলে জেনেছি—যতদিন বেঁচে থাকবো জানবো তুমিই আমার বাবা—এবং চিরদিন তুমি আমার ভাল, আমার মঙ্গলই হয়তো সমস্ত প্রাণ দিয়ে চেয়েছো কিন্তু দেখলে তো বাবা—বিধাতা যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তার ঠাঁই কোথায়ও হয় না—কেউ তাকে ঠাঁই দিতে পারে না।

রজনী এবারে এগিয়ে এসে বলে, ওসব কথা থাক দিদি—তুই পরিশ্রান্ত—হাতমুখ ধুয়ে—

ভয় করছে বুঝি তোমার দাদু—কিছু হবে না—এই দুটো দিন ধরে একটার পর একটা এত আঘাতের পরও যখন এখনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি—তখন—

মলু—চল মা ভিতরে চল—

মহেন্দ্রনাথ এসে মল্লিকার হাত ধরল।

হাত ছাড়ো বাবা—আমি ভিতরে যাচ্ছি—

মল্লিকা ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু মনে হলো যেন তার দেহে এক বিন্দু প্রাণ নেই—কঠিন ভাবে নিঙড়ে শেষ প্রাণ বিন্দুটি পর্যন্ত যেন কে তার বের করে নিয়েছে।

অনেক দিন আগের সেই লজ্জা ও দুঃখের স্মৃতি যেন নতুন করে আবার মনের পাতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মহেশ্বরী—রাধেশ্বরী দুই বোন।

মহেশ্বরী থেকে রাধেশ্বরী পনের বছরের ছোট—এক কথায় মহেশ্বরীর সন্তানের মতই ছিল ছোট বোনটি তার কাছে এবং বরাবর তাকে রাধা বলেই ডেকেছে ওরা স্বামী স্ত্রী।

ছোট—যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স রাধার ওদের মা মারা গেলেন। সেই থেকে রাধা দিদির কাছেই মানুষ।

মহেন্দ্রনাথ তখন কাশীতে।

সংগীতই তার সাধনা।

জমিদারীর কিছু আয় ছিল আর গান শিখিয়ে কিছু কিছু উপার্জন করতেন মহেন্দ্রনাথ। অভাব ছিল না কারণ কোন সন্তানাদি তো ছিল না।

তাছাড়া মহেশ্বরীও ছিলেন গোছান।

রাধা ওদের কাছেই মানুষ হতে থাকে—ক্রমে সে উনিশ বছরে পড়ে।

মহেশ্বরী রাধার জন্য পাত্রের সন্ধান করতে থাকেন।

ঠিক সেই সময় এক রাত্রে রাধা কোথায় নিরুদ্দিষ্টা হয়ে গেল—কিছুদিন পরে জানা গেল—পাড়ার একটি যুবক যতীন সেও ঐ একই রাত থেকে নিরুদ্দিষ্ট।

মহেন্দ্রনাথ খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন কিন্তু এক মাস দু'মাস কেটে গেল কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সংবাদ পাওয়া গেল দীর্ঘ

পাঁচ মাস পরে—ঐ চিঠি।

ইতিমধ্যে নানা জনে নানা কথা রটনাও শুরু করেছিল।

মহেন্দ্রনাথ না ভাবলেও মহেশ্বরী তার বড় আদরের বোন রাধার ঐ রকমই একটা পরিণতি আশা করেছিলেন বোধহয় তার হাবভাব দেখে।

মহেন্দ্রনাথ চিঠিটা পেয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন রাধার খোঁজ-খবর করবার জন্য কিন্তু মহেশ্বরী স্বামীকে সেদিন নিবৃত্ত করেছেন।

আর যাই করুন না তিনি যতীন পরিত্যক্ত রাধাকে তো তিনি আর গ্রহণ করতে পারবেন না তাঁর সংসারে—তার চাইতে তাঁরা যে রটিয়ে দিয়েছিলেন রাধা গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছে লোকে সেটাই জানুক।

কিন্তু মাস দুই বাদে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে যখন টেলিগ্রাফ পেলেন—রাধা মৃত্যুশয্যায়—

কি জানি কেন মহেশ্বরী আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না।

মহেন্দ্রনাথকে নিয়ে ছুটে গেলেন হাসপাতালে—

যখন গিয়ে সেখানে পৌঁছালেন রাধার তার আগেই মৃত্যু হয়েছে। রাধার নবজাত কন্যাটিকে মহেন্দ্রনাথ ও মহেশ্বরী বুকে তুলে নিলেন।

আরো একটা সপ্তাহ ঐ শহরেরই একটা হোটেলে রইলেন ওরা, তারপর সেখান থেকে এসে বাসা বাঁধলেন লক্ষ্ণৌ শহরে।

লক্ষ্ণৌ শহরে সবাই জানল মল্লিকা ওদেরই সন্তান। তারপর একদিন মহেশ্বরীও মারা গেলেন।

রজনী কাকা—

মহেন্দ্রনাথের ডাকে রজনী মুখ তুলে তাকাল।

একি হলো রজনী কাকা। ভেবেছিলাম মেয়েটাকে বিয়ে দেবো—বিয়ে দিয়ে ওর জীবন থেকে ওর অতীতটাকে একেবারে চিরদিনের মত মুছে দিয়ে যাবো।

তুমি যদি বল মহেন্দ্র তো আমি একবার সেখানে যাই—

সেখানে গিয়ে আর কি করবে! একটা পাগল—উন্মাদ—তাছাড়া এমন করে সত্য গোপন করে একটা নিরপরাধ মেয়ের এতবড় সর্বনাশ

করতে পারে যারা—না—তার আর কোন প্রয়োজন নেই রজনী কাকা। এখন মনে হচ্ছে মল্লিকার বিয়ের জন্য আমার দেওয়া কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এবং আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী এতদূরে থাকি সব কিছু ভেবেই হয়ত ভবানী দেবী ঘটক পাঠিয়ে টোপ ফেলেছিলেন। তার ছেলের দোষ ছিল বলেই তিনি আমার মত সাধারণ ঘরের গরীবের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে এত আগ্রহে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায় দেখ—

রজনী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মহেন্দ্রনাথ চুপ করে বসে রইলেন।

মল্লিকা তার ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘরের দরজায় খিল তুলে দিয়েছিল ভিতর থেকে।

খোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়ায় মল্লিকা।

দোতলার খোলা জানালাপথে নীচের রাস্তাটা চোখে পড়ে।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে মল্লিকা—নীচের রাস্তায় প্রবাহমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে।

প্রচণ্ড একটা আক্রোশের জ্বালায় গত দুটো রাত ও দুটো দিন কেবলই ছট্‌ফট করেছে মল্লিকা ও কেবলই ভেবেছে ভবানী দেবীকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

মা ও ছেলেকে আদালতের কাঠগড়ায় এনে সে দাঁড় করাবে। ভবানী দেবী যাই বলুন না কেন মল্লিকা বিশ্বাস করে না—

অসিত নিশ্চয়ই কোন দিন সুস্থ ছিল না।

তবে এমন পাগলের কথাও তো সে শুনেছে যারা হয়ত কিছুদিন বেশ ভাল থাকে তারপর হঠাৎ আবার পাগলামি দেখা দেয়।

অসিতের ব্যাপারটাও হয়ত সেই রকম কিছু—এবং সেটা জেনেই ভবানী দেবী তার ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন যে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই।

কিন্তু কি হয়ে গেল। তার নিজের তো কোন পরিচয়ই নেই—

মুহূর্তের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে যেন তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিল। ভবানী দেবী অন্যায় করেছেন—কিন্তু তারা—তার বাবা মহেন্দ্রনাথ—তাদের প্রতারণা যে আরো জঘন্য—নাম গোত্র পরিচয়-হীনার সব কিছু গোপন করে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

॥ ১১ ॥

মল্লিকা চলে গিয়েছে ব্যাপারটা জানবার পর ভবানী দেবী কি করবেন অতঃপর যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না প্রথমটায়।

কাল উৎসব—সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ভরে যাবে আত্মীয়া-স্বজনে—ইতিমধ্যেই তো অনেকে এসে গিয়েছে।

একটি মাত্র ছেলের বিয়ে ভবানী দেবীর, প্রথমটায় উৎসবের ব্যাপারে একটু দ্বিধা থাকলেও পরে আর সেটা ছিল না—উৎসবটা বেশ জাঁক-জমক করে করবেন বলেই স্থির করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যে অকস্মাৎ এমনি একটা পরিস্থিতিতে মোড় নেবে এ যেন তিনি ভাবতেও পারেন নি।

সকাল পর্যন্তও অসিতের চরিত্রে বা ব্যবহারে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা ভবানী দেবীর নজরে পড়েনি।

কেবল যেন ওকে একটু কেমন অতিরিক্ত শান্ত মনে হয়েছে কিন্তু তারও তো তিনি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাহলেও দ্বিপ্রহরের দিকে সামান্য হলেও একটা ব্যাপার কিন্তু ঘটেছিল—অসিতের সম্পর্কে বৌদি হয়—শীলা এসেছিল উৎসবে কলকাতা থেকে ঐ দিনই সকালে। আধুনিকা কলেজে পড়া মেয়ে—সাজগোজেরও চটক আছে।

অসিত যে ঘরে বসেছিল সেই ঘরে ঢুকে শীলা অসিতের সঙ্গে নানা ধরনের ঠাট্টা করতে শুরু করে ভবানী দেবীর অজ্ঞাতেই। তিনি তখন নানা ব্যাপারে ব্যস্ত।

অসিতের চোখে মুখে যে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছে

করে সে যদি সেজেগুজে সামনে এসে দাঁড়ায় অসিতের—চোখে মুখে তার যেন একটা স্পষ্ট বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায়। দুচোখের জ্রতে জ্রকুটি জেগে ওঠে।

অসিত যেন কেমন অস্থির চঞ্চল হয়ে পড়ে। সেই থেকেই পারতপক্ষে ভবানী দেবী ছেলের সামনে কোন সুবেশা—সুসজ্জিতা তরুণীকে যেতে দিতেন না।

একমাত্র ছেলে—বয়েস হয়েছে বিবাহ দেবেন ভবানী দেবী ভাবেন, কিন্তু ওর স্বভাবের কথা ভেবে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

তারপর নিজেই ভাবলেন ওটা হয়ত কিছুই না—কোন একটি লেখাপড়া জানা ভাল মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলে ক্রমশঃ তার সাহচর্যে হয়ত তার মনের ঐ বিকার বা অস্বাভাবিকতাটা কেটে যাবে। তাহলেও কুলগুরু বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বাগচী মশাইয়ের কাছে কথাটা একদিন উত্থাপন করলেন ভবানী দেবী—তিনি বললেন, ওর কোষ্ঠীটা একবার ভাল করে আর একবার বিচার করে দেখি তারপর তোমায় বলবো মা।

বিচার করে বাগচী মশাই বললেন, দেখো মা তোমার ছেলে মনের দিক দিয়ে একটু অস্বাভাবিক প্রকৃতির—যদি তেমন একটি কন্যা পাওয়া যায়—এবং উভয়ের কোষ্ঠী বিচার করে শুভ ফল হবে মনে হয় সে মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিবাহ দিতে পার। হয়ত তাতেই তোমার ছেলে তোমার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

ভবানী দেবী পাত্রীর খোঁজ করতে লাগলেন, শিবু ঘটককে পাত্রী সন্ধান করতে বললেন, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিলেন।

অনেক মেয়ে দেখা হলো কোষ্ঠ বিচার করা হলো কিন্তু বাগচী মশাই একের পর এক সব নাকচ করে দেন।

অবশেষে বাংলা দেশের বাইরে শিবু ঘটককে পাত্রী দেখতে বললেন, শিবু কাশী এলাহাবাদ কানপুর লক্ষ্ণৌ ঘুরে ঘুরে কয়েকটি পাত্রীর সন্ধান নিয়ে এলো, তার মধ্যে মহেন্দ্রনাথেরই দেওয়া এক বিজ্ঞাপনের সূত্র থেকে মল্লিকার সন্ধানও নিয়ে এল। এবং মল্লিকার কোষ্ঠীর সঙ্গেই

মিলল অসিতের কোষ্ঠী। রাজজোটক।

বাগচী মশাই বললেন, এই মেয়েটির সঙ্গে চেষ্টা করে দেখো মা। এই কন্যা তোমার পুত্রের জীবনে সর্ববিধ মঙ্গল আনবে।

মঙ্গলকারিণী হবে।

শিবু ঘটককে ডেকে উপদেশ দিয়ে ভবানী দেবী লক্ষৌতে পাঠালেন, বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে।

প্রথম বারেই শিবু কন্যার একটি ফটো নিয়ে এসেছিল।

ফটো দেখেই ভবানী দেবীর মল্লিকাকে পছন্দ হয়েছিল।

মেয়ে দেখার কোন প্রয়োজন নেই।

শিবু লক্ষৌয়ে গিয়ে সেই শর্তে মহেন্দ্রনাথকে বললো।

তারপর তো মহেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে শিবু চলে এলো।

তা সত্ত্বেও ডাক্তারের পরামর্শ ও মত নিলেন ভবানী দেবী—ডাক্তারকে বললেন, যদি বিবাহের সময় অসিত কোন গোলযোগ করে!

ডাক্তার বললেন, ভয় নেই আমি একটা ঔষধ দেবো—পর পর কয়েক দিন সেটা খেতে দেবেন ওকে—

তারপর তো সবই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে—

অকস্মাৎ দুপুরের ঐ ঘটনার পর ভবানী দেবী কেবলই ভাবছিলেন ফুলশয্যার উৎসব কেমন করে সম্পন্ন করবেন।

যদিও ডাক্তারের পূর্ব পরামর্শ মত অসিতকে ঔষধ সেবনও করান হয়েছিল সে দিনও।—আগের দুদিনের মত।

অসিত তার ঘরে সন্ধ্যা থেকেই ঘুমাচ্ছিল—

ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস পান নি ভবানী দেবীর ছেলের। কিন্তু অসিত যে মধ্যরাত্রে এক সময় ঘুম ভেঙ্গে উঠে মল্লিকার ঘরে চলে গিয়েছে জানতেও পারেন নি—চেঁচামেচি শুনে ছুটে যান ঘরে।

অসিত তো তখন রীতিমত অপ্রকৃতিস্থ—

রীতিমত ভয় পেয়ে যান ভবানী দেবী—প্রথমটায় কি করবেন বুঝতেই পারেন না—ভাগ্যি মায়া সময়মত ছুটে গিয়েছিল এবং তার

তাকে করালী ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল—

পাশের ঘরে অসিতকে যখন করালী টানতে টানতে নিয়ে এলো—মিথ্যে নয় সত্যিই তখন অসিত উন্মাদ—পাগল—

চেঁচামেচি করছে—এটা ছিঁড়ছে—ওটা ভাঙ্গছে—সে এক অভাবনীয় বিশৃঙ্খলতা—অস্থিরতা।

মায়াই তাড়াতাড়ি ওদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান নরেশ ডাক্তারকে তখুনি করালীকে পাঠিয়ে ডেকে আনায়।

করালী ইতিমধ্যে বহুকষ্টে অসিতকে হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে গিয়েছিল—

নরেশ ডাক্তার এসে একটা তখুনি ইন্‌জেকশন দিলেন—

ধীরে ধীরে এক সময় অসিত শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে অতঃপর শয্যায় তুলে শুইয়ে দেওয়া হলো বটে তবে হাত পা বেঁধে রাখা হলো ডাক্তারেরই পরামর্শে—

একি হলো ডাক্তারবাবু—

উদ্বিগ্না ভবানী দেবী শুধান।

হঠাৎ এমন excited হয়ে উঠলেন কেন উনি ?

কি জানি বুঝতে পারছি না—

কিন্তু এ তো দেখছি রীতিমত মত্ত অবস্থা—চিন্তার বিষয় হলো। এখন observation ও watch করা ছাড়া আর তো করবার কিছু দেখছি না—

নীচের তলায় সব আত্মীয়রা এসে গেছে—কাল উৎসব—ভোরে আরো কতজন আসবে—এখন আমি কাকে কি বলি—

কি আর করবেন বলবেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে ও তাই সব বন্ধ করে দিলেন আপনি—তা ছাড়া তো আর কোন পথ দেখছি না ভবানী দেবী।

॥ ১২ ॥

নরেশ ডাক্তার চলে গেছেন।

অসিত ঔষধের প্রভাবে অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

ভবানী দেবী অসিতের শয্যাপার্শ্বে যেন পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন।

পিসিমা—

হঠাৎ মায়ার ডাকে চমকে ফিরে তাকালেন ভবানী দেবী—

পিসিমা বৌ তো নেই—

বৌ নেই!

না—তার ঘরে সে নেই—

নেই তো কোথায় গেল?

উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙ্গে পড়েন ভবানী দেবী।

উপরের তলায় সব ঘর খুঁজেছি সে নেই—

তবে কি সত্যি সত্যিই চলে গেল?

তাই তো মনে হচ্ছে—

মৃদু কণ্ঠে মায়া জবাব দেয়।

ভবানী দেবী যেন হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন।

বৌদি নিশ্চয়ই স্টেশনের দিকেই গেছে, যাবো একবার আমি স্টেশনে?

স্টেশনে!

হ্যাঁ—এখানে আর তার কে আছে, কোথায় যাবে—কার কাছেই বা যাবে—আমি একবার যাই পিসিমা—

যাবার জন্যই বোধ হয় মায়া পা বাড়ায় কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বাধা দেন ভবানী দেবী।

না মায়া—

পিসিমা—

না থাক। যাক সে—যেতে দে—আমাদের ইজ্জতের প্রশ্ন কিন্তু তার যে সারাটা জীবনের প্রশ্ন।

তারপরই একটু থেমে বলেন—

ছিঃ ছিঃ, এ আমি কি করলাম মায়া—নিজের স্বার্থের জন্য একটা নিরপরাধ মেয়ের জীবনটার উপর চিরদিনের মত একটা দাগ কেটে দিলাম।

তুমি তো আর ইচ্ছা করে কিছু করোনি পিসিমা—

অদূরে ঘরের মধ্যে শয্যায় হাত পা বাঁধা শায়িত এবং ঔষধের প্রভাবে নিদ্রিত পুত্রের দিকে তাকিয়ে ভবানী দেবী বলেন, ইচ্ছা করেই বৈকি মা নচেৎ নিজের পুত্রের মঙ্গলের কথাটাই কেবল মনে পড়লো কিন্তু আর একটি নিরপরাধিনী মেয়ের কথাটা একবারও মনের মধ্যে উদয় হলো না কেন। তাছাড়া অসিত যে সত্যি সত্যিই একেবারে সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল না সে কথাটাও তো মিথ্যা নয় মা।

অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলে যান ভবানী দেবী।

মায়া ভবানী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ভুল বলবো না মা—অন্যায়ই বলবো। অন্যায় সত্যিই আমরা তার প্রতি করেছি এবং সে অন্যায়ের প্রতিকার আমাকেই করতে হবে বৈকি।

একটু থেমে আবার বলেন ভবানী দেবী, কালই মল্লিকার বাবাকে একটা চিঠি লিখে দে মা—তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন আর তাঁর ও তাঁর কন্যার প্রতি যে অন্যায় আমরা করেছি তার যে কোন প্রতিকার করতে আমরা প্রস্তুত। তিনি যেন তাঁর মেয়ের এই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে নালিশ করেন—আমরা সত্য কথাই বলবো—বিবাহ বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই হয়ে যাবে তারপর যেন তিনি আবার তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন—

মায়া হ্যাঁ বা না কোন কথাই বলে না। যেমন নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে।

কত বড় দুঃখে ও কত বড় লজ্জায় যে ভবানী দেবী ঐ কথাগুলো

বললেন মায়া সেটা যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছিল।

জানালা পথে রাত্রি শেষের তরল অন্ধকারে অত্যাসন্ন উষার ইঙ্গিত।

সানাই বাজছিল—

সারাটা রাত সানাই বেজেছে। থামেনি। রামকেলী রাগে সানই বাজছিল তখন।

আরো শোন মা—নীচে গিয়ে সরকার মশাইকে আমার কথা বলে জানিয়ে দিয়ে আয় উৎসব বন্ধ করে দিতে—

মায়াকে আর যেতে হলো না—করালীর গলা শোনা গেল ঐ সময়—সে ঘরের বাইরে দরজার পাশে চুপ করে বসে ছিল।

ভবানী দেবী ছাড়া আর যে দ্বিতীয় প্রাণীটির সঙ্গে পৃথিবীতে অসিতের যা কিছু সম্পর্ক ছিল তা ঐ প্রৌঢ় করালীচরণের সঙ্গেই।

করালীও জানত অসিত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়—তার ব্যবহারে ও চরিত্রে কোথায় যেন একটা অস্বাভাবিকতা আছে কিন্তু সেটা যে এমনি অকস্মাৎ একটা তীব্র ভয়াবহ রূপ নেবে সেটাই বুঝি করালী-চরণের চিন্তারও অতীত ছিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় বিহ্বল করালী কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে দরজার গোড়ায় বসে ছিল—

সরকার মশাইকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ায়।

মা কোথায় করালী—

করালী তাড়াতাড়ি উঠে বাধা দেয়, দাঁড়ান—মা ভিতরে আছেন ডাকছি—

মা—সরকার মশাই এসেছেন—

দাঁড়াতে বল আসছি—

বলতে বলতে ভবানী দেবী ঘরের বাইরে এসে ঘরের দরজাটা টেনে দিলেন।

সরকার মশাই—

বলুন—

উৎসব হবে না—

উৎসব হবে না? পুনরাবৃত্তি করলেন সরকার মশাই যেন ভবানী দেবী কথাটার।

হ্যাঁ—সব বন্ধ করে দিন—ঐ সানাইওয়ালাকে বিদায় করে দিন—সামিয়ানা খুলে ফেলুন—

কিন্তু হঠাৎ এমন কি হলো মা যেজন্য—

যাদের কাছে সব জিনিসের অর্ডার দেওয়া আছে সবার দাম দিয়ে অর্ডার ফিরিয়ে দিন—

সরকার মশাই চেয়ে থাকেন ভবানী দেবীর মুখের দিকে।

আর একটা কাজ আপনাকে করতে হবে সরকার মশাই—

হতভম্ব বিস্মিত সরকার মশাই কেবল নিঃশব্দে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কর্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

যে সব আত্মীয়স্বজনরা এসেছে—নীচের তলায় আছে তাদের সব ভাড়া দিয়ে যে যার বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন এবং আজ যারা এসে পৌঁছাবে তাদেরও ঐ ব্যবস্থাই করবেন—বলবেন আমি হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছি—তাই উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—যান—আগে সানাইওয়ালাকে গিয়ে বাজনা থামাতে বলুন—

কথাগুলো বলে ভবানী দেবী তার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন এবং সরকার মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি সকলকে বলবেন কেউ যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় যে ডাক্তারের বিশেষ নিষেধ আছে আমার সঙ্গে কারো দেখা করবার।

সরকার মশাই নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন।

ভবানী দেবী তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দিনই সন্ধ্যার দিকে সুহাস এলো। গহনা ও শাড়ি একটা অ্যাটাচীকেসের মধ্যে, সেটা হাতে ঝুলিয়ে।

প্রথম তো সরকার মশাই দেখাই হবে না বলেছিলেন কিন্তু সুহাস যখন বললে সে না দেখা করে কোন মতেই যাবে না—সরকার মশাই অনন্যোপায় হয়ে উপরে মায়াকে সংবাদটা পাঠালেন।

সুহাস মল্লিকার কাছ থেকে এসেছে শুনে মায়াই তাকে উপরে ডেকে পাঠাল।

সুহাস উপরে এসে বললে, আমি ভবানী দেবীর সঙ্গে একটিবার দেখা করতে চাই—

তাঁর শরীরটা তো ভাল না তার সঙ্গে দেখা হবে না। কি দরকার আপনার, কেন তার সঙ্গে দেখা করতে চান আমাকেই বলুন—

আপনি কে জানতে পারি ?

আমি ভবানী দেবীর ভাইঝি—

ও তা দরকার যে তাঁর সঙ্গেই আমার—

ভবানী দেবী ঐ সময় ঘরে এসে ঢুকলেন, কে আপনি ?

আমাকে আপনি বলবেন না। আমার নাম সুহাস—আমি মল্লিকার কাছ থেকে আসছি—আপনিই বোধহয় ভবানী দেবী।

হ্যাঁ—

আপনার সঙ্গে আমার কিছু প্রয়োজনীয় কথা ছিল—

মল্লিকা তোমার কে হয় ?

সুহাস মৃদু হেসে বলে, কেউ নয়—এককালে আমিও লক্ষ্ণৌতেই ছিলাম—ওদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়—

ভবানী দেবী কয়েকটা মুহূর্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুহাসের আপাদমস্তক দেখলেন, তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, বৌমা কোথায় ?

সে লক্ষ্ণৌ চলে গিয়েছে তার বাবার কাছে—

তুমি কি লক্ষ্ণৌ থেকেই আসছো ?

না। আমি এখন কলকাতায় থাকি। সেখান থেকেই আসছি—ভাগ্যক্রমে পরশু তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়—ট্রেনে।

সংক্ষেপে সুহাস ব্যাপারটা বিবৃত করে।

ভবানী চুপ করে থাকেন।

সুহাস তার হাতের সুটকেসটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে, সে এই গহনাগুলো আপনাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিল—

গহনা ?

হ্যাঁ—আর এই চিঠিটা—

পকেট থেকে কাগজ একটা ভাঁজকরা অতঃপর সুহাস বের করে দেয়।

এক লাইনের চিঠি—এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন ভবানী দেবী।

আপনি যদি গহনাগুলো একটিবার দেখে নিতেন—

হাসলেন ভবানী দেবী, কোন প্রয়োজন নেই বাবা।

হঠাৎ কঠিন কণ্ঠে সুহাস বলে, আছে বৈকি—

সুহাসের গলায় কঠিন সুরটা ভবানী দেবীকে যেন চম্‌কে দেয়—ভবানী দেবী সুহাসের মুখের দিকে তাকান।

আপনারা কি মনে করেন একটি ভদ্রঘরের মেয়ের সঙ্গে আপনারা যে জঘন্য প্রতারণা করেছেন তারপরও সে আপনাদের এগুলো গ্রহণ করতে পারে—

ভবানী দেবী নিঃশব্দে চেয়ে থাকেন—

সুহাস সমান কণ্ঠে বলতে থাকে, না ভেবেছিলেন জোচ্চোরি করে এই সোনার গহনাগুলো দিয়ে তার খেসারৎ দেবেন।

মায়া আর সহ্য করতে পারে না।

সে বলে ওঠে, কাকে আপনি কি বলছেন!

সুহাস জবাব দেয়, মিথ্যা যে আমি বলছি না তা কি উনি জানেন না—তাই তো কোন কথা বলতে পারছেন না। চুপ করে আছেন—

এতক্ষণে ভবানী দেবী কথা বলেন, ও তো ঠিকই বলেছে মায়া—একটুও তো মিথ্যা বলেনি—আমরা তো অন্যায় করেছিই—প্রতারণা তো করেছিই—তুমি ঠিকই বলেছো—যে অন্যায় আমরা করেছি তার ক্ষমা হয় না—তবু তোমার কাছে একটা অনুরোধ—মনে করো না এটা খেসারৎ বা অন্য কিছু—ওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও—তাকে বলো—

ওগুলো একজন মায়ের তার পুত্রবধূকে আশীর্বাদ—

হঠাৎ যেন ভবানী দেবীর শেষের কথায় চম্‌কে সুহাস ওর মুখের দিকে তাকায়।

এত রূঢ় কথার পরও কেউ অমন করে কথা বলতে পারে!

ওগুলো তাকে যে আমি আশীর্বাদ দিয়েছি—আশীর্বাদ কি ফেরত নেওয়া যায় বাবা—ও তো আর আমি ফিরিয়ে নিতে পারি না।

কিন্তু—

আমতা আমতা করে থেমে যায় সুহাস।

ভবানী দেবী বলেন, না ওগুলো তার—সে আমায় স্বীকার করুক বা না করুক আমি চিরদিন জানব—সেই এ বাড়ির বধূ—

আমি—আমি তাহলে যাই—

হঠাৎ যেন সুহাস একেবারে নিভে গিয়েছে তখন।

একটা কথা বলছিলাম বাবা—

বলুন?

একটা উপকার যদি তুমি আমার করো—

উপকার—

হ্যাঁ—মল্লিকাকে বলো—সে যেন আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে, আর—

ভবানী দেবী যেন নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলেন।

একটু যেন নিজেকে সামলে নিলেন।

তার পর রুদ্ধগলায় বললেন, সে ইচ্ছা করলে এ বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আদালতে নালিশ করতে পারে।

সুহাস যেন চমকে ওঠে।

বলে, এ আপনি কি বলছেন?

ঠিকই বলছি বাবা। আমরা সত্য গোপন করে বিয়ে দিয়েছি—অন্যায় করেছি—অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে বৈকি।

কিন্তু—

তার সমস্ত জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দেবার তো কোন অধিকারই

আমাদের নেই—আর তা করবই বা কেন ? সে আবার বিয়ে করে সুখী হোক। বল বাবা কথা দাও, এ কথাগুলো তাকে তুমি বলবে—

বলবো, আমি বলবো আপনি যখন অনুরোধ জানাচ্ছেন—

হ্যাঁ বলো। আমাদের দিক থেকে যা করণীয় তা আমরা করবো। ঐ সুটকেসটা—ওটা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও বাবা—

ফিরিয়ে নিয়ে যাবো ! কিন্তু সে যদি না নেয়—

নিতে চাইবে না—সামান্য যেটুকু পরিচয় তার আমি পেয়েছি—তাতেই বুঝেছি। বলো শাশুড়ীর নয় এক অভাগিনী মায়ের এ আশীর্বাদ—এতে কোন অন্যায় নেই—পাপ নেই—নির্মল শুদ্ধ আশীর্বাদ। মা তার মেয়েকে দিয়েছে।

সুহাস কি বলবে অতঃপর বুঝতে পারে না।

এমন অন্তঃকরণ যে কোন নারীর হতে পারে এ বুঝি তার চিন্তারও অতীত ছিল।

মুগ্ধ-বিহ্বল সে যেন বাক্যহারা হয়ে যায়।

নিয়ে যাও বাবা ওগুলো তুমি। তাকে বলো সত্যিকারের ভালবেসে কেউ কিছু দিলে সেটা ফিরিয়ে দিতে নেই। মহেন্দ্রবাবু, মল্লিকার বাবা তাকেও বলো তিনি যেন আমায় মার্জনা করেন—তাঁকেও আমি পত্র দেবো—

অদ্ভুত গলার স্বর শান্ত কিন্তু তবু মনে হয় কোথায় যেন একটা দীর্ণ হাহাকার গুমরে গুমরে উঠছে ভদ্রমহিলার।

একটু থেমে আবার ভবানী দেবী বলেন, মল্লিকা বিশ্বাস করে নি—জানি হয়ত মহেন্দ্রনাথও করবেন না—তবু তোমাকে বলছি সত্যিই জেনেশুনে ইচ্ছে করে এ কাজ আমি করিনি—আর যাই হোক যদি জানতাম এমনি করে কোন দিন অসিত উন্মাদ হয়ে উঠবে তাহলে নিজে মেয়েমানুষ হয়ে আর একজন মেয়ের বিশেষ করে যে আমার সন্তানের বয়েসী তার এত বড় সর্বনাশ নিশ্চয়ই আমি করতাম না।

ভবানীর চোখ দুটো যেন মনে হয় সুহাসের ছল ছল করে ওঠে।

বলবো নিশ্চয়ই বলবো—মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় তার পর একটু

ইতস্ততঃ করে বলে, আমি একজন ডাক্তার মা—অসিতবাবুকে একটিবার আমি দেখতে পারি কি ?

কেন পারবে না—নিশ্চয়ই পারবে—তার পর অদূরে দণ্ডায়মান মায়ার দিকে তাকিয়ে ভবানী দেবী বললেন, মায়া, সুহাসকে অসিতের ঘরে নিয়ে যা মা।

ভবানী দেবী কথাটা বলে আর দাঁড়ালেন না।

নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

॥ ১৩ ॥

ভবানী দেবীর চলমান মূর্তিটার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সুহাস।

ভদ্রমহিলার শুধু কথায়ই নয়—দাঁড়াবার ভঙ্গি—চলার মধ্যে এমন একটা সহজ আভিজাত্য আছে যাতে করে যেন মনে হয় কোন অন্যায় কোন নীচতাই বুঝি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না কখনো কোন কারণেই।

সমস্ত কিছু ক্ষুদ্রতার যেন অনেক উর্ধ্বে উনি।

চলুন—

মায়ার ডাকে যেন সম্বিৎ ফিরে পায় সুহাস। ফিরে তাকায়।

চলুন—

হ্যাঁ—চলুন।

মায়াকে অনুসরণ করে সুহাস এসে অসিতের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

দিবা দ্বিপ্রহর হলেও ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছিল।

ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ—অন্ধকার—এক কোণে একটি উঁচু স্ট্যাণ্ডের উপরে বাতিদানে ঘেরটোপ ঢাকা একটি স্বল্প পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে—তারই স্বল্প আলোয় ঘরের মধ্যে একটা আলো-আঁধারি।

ঘরের এক কোণে শয্যার উপর অসিত শায়িত—

হাত পা বাঁধা।

ঘুমাচ্ছে—ঔষধের ক্রিয়ায়।

শিয়রের কাছে একটা গোলাকার শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপরে কিছু ঔষধপত্র—ফিডিং কাপ একটি—রবারের নল—একটা সুদৃশ্য টেবিল ক্লক।

টিক টিক শব্দ করে চলেছে ক্লকটা একটানা।

টেবিল বাতির মৃদু আলো অসিতের চোখে-মুখে এসে পড়েছে।

দুটি চক্ষু মুদ্রিত।

শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখাবয়ব।

সুহাস একবার অসিতের ডান হাতের কব্জিটা টিপে নাড়ির গতিটা পরীক্ষা করল।

মায়ার দিকে ফিরে তাকাল সুহাস, ওকে দেখছেন কে?

এখানকার স্থানীয় একজন ডাঃ নরেশ গুহ।

জেনারেল ফিজিসিয়ান?

হ্যাঁ—বরাবর এ বাড়ির যা কিছু হোক উনিই দেখাশোনা করেন।

কিন্তু এসব ব্যাপারে কোন স্পেশালিস্ট মানে বলছিলাম কোন মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দেখালেই ভাল হতো বোধহয়?

মৃদু কণ্ঠে মায়া জবাব দেয়, হ্যাঁ ডাঃ গুহও তাই বলছিলেন—একটু সুস্থ হলে—ওর ঐ ভায়োলেণ্ট্ ভাবটা একটু কমলে ডাঃ গুহ বলছিলেন—কলকাতায় নিয়ে যাবেন—

আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো—কলকাতার একজন বড় সিকায়াট্রিস্টের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে তাকেও দেখিয়ে দেওয়া যায়—

পিসিমাকে বলবেন আপনি—

চলুন বাইরে যাওয়া যাক—সুহাস আবার বলে।

দুজনে অতঃপর ঘরের বাইরে চলে এলো।

অন্ধকারের পরে আবার প্রখর দিবালোক। অদ্ভুত স্তব্ধ যেন অতবড় প্রাসাদতুল্য বাড়িটা। কোথায় কোন আলিসায় বা অলিন্দে কবুতরের গুঞ্জন মধ্যে মধ্যে সেই পাষাণ স্তব্ধতা যেন ভঙ্গ করছে থেকে থেকে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম মায়া দেবী—

বলুন—

এর আগেও কি অসিতবাবুর এরকম কখনো হয়েছে ?

না।

আপনি ঠিক জানেন ?

জানি—

কতদিন আপনি এখানে আছেন।

খুব ছোট বয়েস থেকেই—তারপর একটু থেমে মায়া আবার বলে, এরকম হওয়া তো দূরের কথা বরং বরাবর দেখেছি ছোড়দা খুবই শান্ত ও ভাবুক প্রকৃতির। স্কুল-কলেজে পড়েছে কিন্তু সেখানেও কারো সঙ্গে একটা বড় মেশেনি—কথা বলেনি বা কোন বন্ধু ওর দেখিনি—বাড়িতেও যতক্ষণ সময় জেগে থাকে নিজের ঘরেই লেখাপড়া বা ছবি আঁকা নিয়ে নিজের মধ্যে নিজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি—

বরাবরই তাহলে কতকটা আত্মসমাহিত বলুন—

বলতে পারেন তাই।

এর আগে এই ধরনের না হলেও কখনো কোন সামান্য abnormalityও ব্যবহারে বা কথায়-বার্তায় কখনো প্রকাশ পায়নি—

না তো—তবে—

তবে ?

সাজাগোজা কোন মেয়েকে সামনে দেখলেই যেন কেমন একটা বিরক্তি ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠতে দেখেছি। শুধু বিরক্তিই নয় বেশ যেন রুষ্ট—চোখমুখ লাল থমথমে হয়ে উঠেছে—তাই ওর ঘরে পিসিমা ও আমি ছাড়া কারো যাবার হুকুম ছিল না—

হুঁ—আচ্ছা আমি তাহলে এবারে যাই—

আপনি বসুন, আমি পিসিমাকে খবর দিই—

না না—আবার তাঁকে বিরক্ত করবেন কেন ?

না আপনি বসুন, পিসিমাকে না বলে চলে গেলে তিনি দুঃখিত হবেন।

সুহাসকে একটা ঘরে বসিয়ে মায়া ভবানী দেবীকে খবর দিতে

চলে গেল।

বেশ প্রশস্ত হলঘরের মতই ঘরটা।

ঘরের আসবাব ও সব কিছুর মধ্যেই যেন বনেদী ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের স্বাক্ষর।

সেকেলে মনোরম কারুকার্য-করা ভারী ভারী দামী সব আসবাবপত্র —প্রলম্বিত ঝাড়লণ্ঠন—দেওয়ালের গায়ে ঝোলান দামী চওড়া সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো সব দেশী ও বিদেশী চিত্রকরদের আঁকা ছবি ও ফটো।

অসিতের কথাই ভাবছিল সুহাস।

কে বলবে—অসিত অসুস্থ! ঠিক যেন ঘুমাচ্ছে।

মল্লিকার মুখে যে বর্ণনা শুনেছে তার বিন্দুমাত্রও যেন কোথায়ও নেই।

অসিত পাগল—উন্মাদ! বিকৃত-মস্তিষ্ক!

কিন্তু এই পৃথিবীতে অল্পবিস্তর মস্তিষ্কের বিকৃতিতে ভুগছে কে না! নরম্যাল—স্বাভাবিক ও এ্যাবনরমাল—অস্বাভাবিকের সত্যিকারের সংজ্ঞাটা কি?

ঐ সুন্দর সবল দেহী—স্বাস্থ্যে ভরপুর মানুষটা সুস্থ নয় বা আবার একদিন সুস্থ হয়ে উঠবে না কথাটা ভাবতেও যেন সুহাসের মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

প্রথমে মায়ার হাতে তার রূপার রেকাবিতে কিছু মিষ্টি ও রূপার গ্লাসে জল এবং পশ্চাতে ভবানী দেবী এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

এসব আবার আনতে গেলেন কেন মায়া দেবী—ছিঃ ছিঃ দেখুন তো—

বিশেষ কিছু না বাবা—সামান্য ছুটো মিষ্টি—আমার বৌমার পরিচিত লোক আত্মীয়ের মতই বুঝতে পারছি—আজ সব কিছু হঠাৎ অন্যরকম না হয়ে গেলে তুমি এসেছো কত আনন্দের হতো—

কথাগুলো শেষ করলেন না আর ভবানী দেবী—একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন তাঁর বুকখানা কাঁপিয়ে বের হয়ে এলো।

মায়া রেকাবি ও গ্লাসটা সামনের একটি শ্বেত পাথরের টেবিলের

ওপর নামিয়ে রেখে বের হয়ে গেল।

খাও বাবা

সুহাস আর দ্বিরুক্তি করে না—একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে জলটা চকঢক করে গলায় ঢেলে দেয়।

মায়া বলছিল, কি স্পেশালিস্টের কথা তুমি বলছিলে?

হ্যাঁ - আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে—

আপত্তি কেন থাকবে, কিন্তু কোন ফল হবে কি?

কেন হবে না! এরকম কত তো সম্পূর্ণ আবার সুস্থ হয়ে গিয়েছে—সেরকম নজিরেরও তো অভাব নেই—

বেশ। তবে তুমি ব্যবস্থা কর—

আমি কালই নিয়ে আসবো ডাঃ দে-কে—

এনো—

আজ তাহলে উঠি মা—

এসো—

সুহাস নমস্কার করে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

পরের দিনই সুহাস শহরের বিখ্যাত মানসিক রোগের চিকিৎসক ডাঃ দেকে নিয়ে ওখানে গেল।

বেশ বয়েস হয়েছে ডাঃ দে'র।

ছোটখাটো রোগা মানুষটি।

একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, সব পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা।

মানসিক রোগের চিকিৎসক, কিন্তু ভারি হাসিখুশি।

অসিতের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। এবং তার ভিরুলেণ্ট্ ভাবটাও অনেকটা কমে এসেছিল। অনেকটা শান্ত।

তাহলেও হাত দুটো তার বাঁধা ছিল।

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন ডাঃ দে—অনেক প্রশ্ন করলেন

ভবানী দেবীকে।

তারপর দুটি কথা বললেন, সুহাস, প্রথমতঃ ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও—

খুলে দেবো স্যার—

হ্যাঁ দাও—

তারপর ভবানী দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ বাড়ি থেকে কিন্তু ওকে অবিলম্বে সরিয়ে নিতে হবে। এই পরিচিত এ্যাটমসফিয়ারে ওকে আমি রাখতে চাই না—

বেশ—কলকাতায় আমার বাড়ি আছে—সেখানেই নিয়ে যাবো।

Sooner the better—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করবেন—

কথাটা বলে ডাঃ দে আবার সুহাসের মুখের দিকে তাকালেন, সুহাস—

স্যার—

ওর সর্বক্ষণের জন্য প্রথমত একজন সেবিকার দরকার—আর একজন ডাক্তারের close observationয়ে রাখতে হবে—তুমি পারবে না দেখতে ?

কেন পারব না স্যার—নিশ্চয়ই পারবো—ওরা কলকাতায় থাকলে তো আমার কোন অসুবিধাই নেই—

অতঃপর স্থির হলো ঐ দিনই বিকালের গাড়িতে সবাই কলকাতায় চলে যাবে।

সুহাসকে ছাড়লেন না ভবানী দেবী।

বালীগঞ্জ অঞ্চলে বিরাট বাড়ি ওদের—খালিই ছিল, ভবানী দেবী সকলকে নিয়ে সেখানে এসে উঠলেন।

গত দুটো দিন সুহাস মল্লিকার কথা একটিবারও ভাববার সময় পায়নি।

আজ গৃহে ফিরে এসে মল্লিকার কথাই ভাবছিল সুহাস।

ছোট দোতলা একটা সম্পূর্ণ বাড়ি নিয়ে সুহাস থাকে।

একতলায় চেম্বার।

দোতলায় থাকা-খাওয়া। একজন কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড আছে—

শ্রীমান প্রসন্ন।

সেই সংসার চালায়।

সুহাস ভাবছিল মল্লিকার একটা সংবাদ নেওয়া প্রয়োজন—সে অমনি করে চলে গেল লক্ষ্ণৌ!

মনের ঐ অস্থির অবস্থা তার—

আরো মনে হয় ইদানীং ভবানী দেবীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় মল্লিকা হয়ত ঠিক সুবিচার করেনি ভবানী দেবীর প্রতি।

আর সেটা অন্তত: মল্লিকার জানা প্রয়োজনই—মহেন্দ্রনাথেরও জানা প্রয়োজন, ভবানী দেবী ঠিক প্রতারণা ওদের সঙ্গে করেন নি—

॥ ১৪ ॥

মল্লিকা সেই যে ঘরের দরজা ভিতর থেকে তুলে দিয়েছিল আর খোলেনি।

রজনী ও মহেন্দ্রনাথের বার বার ডাকাডাকি সত্ত্বেও কোন সাড়া দেয়নি।

ডেকে ডেকে ওরা চুপ করে গিয়েছিল।

আশ্চর্য! আজকের দিনেও মল্লিকার যেন মনে হচ্ছে তার সব কিছু মিথ্যা ও ব্যর্থ হয়ে গেল। তার অস্তিত্বটাই যেন নিষ্ঠুর একটা ব্যঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তার কনভেণ্টের শিক্ষা—এ যুগের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যে মুহূর্তে এমনি করে যুগ-যুগান্তের একটা অন্ধ সংস্কারের আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে—তার পায়ের তলার শক্ত মাটিটা এমনি করে চোখের পলকে ধ্বসে যেতে পারে এ কি পাঁচ দিন আগেও ভাবতে পেরেছে মল্লিকা!

না এ সেই অন্ধ কুসংস্কারের বিষক্রিয়া যা তার দেহের রক্তেও তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সংক্রামিত হয়েছিল!

এবং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাকে তার স্বীকৃতি দিতেই হবে। এ যুগের সমস্ত যুক্তিতর্ককে ধূলিসাৎ করে দেবে।

বোধহয় তো তাই—

নচেৎ এমনটাই বা হ'লো কেন!

কোন—কোন সান্ত্বনাই যে নেই তার। যদি তার জন্মদাতা তার গর্ভধারিণীকে অমন করে কাপুরুষের মত ত্যাগ করে পালিয়ে না যেত—বিবাহ না হয় তাদের নাই হয়েছিল—তবুও ভালবাসার পবিত্র নিষ্ঠার দাবীটুকু সেই গৌরবটুকুকেই আজ মাথায় তুলে নিয়ে সে সবার সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারত।

কিন্তু এখানেই বা আর কেন—

মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার আর কি সম্পর্ক! কোন্ দাবী নিয়ে সে এখানে আর পড়ে থাকবে? তার মা একদিন এদের স্বামী-স্ত্রীর পায়ে মাথা খুঁড়ে তার জন্য ভিক্ষা করেছিল সেই লজ্জাটাই কোন দিন সে ভুলতে পারবে না—কোনদিন সেজন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না—আবার নতুন করে লজ্জা ও ঋণের বোঝা বাড়ানো কেন!

ছোট একটা চিঠি লিখলো একটা কাগজ টেনে নিয়ে মল্লিকা।

বাবা,

আমি চললাম। আমার খোঁজ করবার চেষ্টা করো না। দুঃখ করো না। শুধু আমি দেখতে চাই জন্মের স্বীকৃতিটাকে অস্বীকার করেও বাঁচবার অধিকার—স্বীকৃতি পাওয়া যায় কি না? ইতি

মল্লিকা

চিঠিটা লিখে ভাঁজ করে টেবিলের উপর কালীর দোয়াতটা দিয়ে চেপে রেখে একটা স্যুটকেসে কিছু জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে দরজা খুলে পা টিপে টিপে মল্লিকা ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

অন্ধকার স্তব্ধ বাড়িটা। মহেন্দ্রনাথ ও রজনী দাদু দুজনেই হয়তো ঘুমাচ্ছেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজা খুলে মল্লিকা রাস্তায়

এসে পড়ল।

শীতের রাত্রি।

রাত বারটা না বাজতে বাজতেই সব কেমন নির্জন নিঝুম হয়ে যায়।

মানুষজন পথে বড় একটা দেখাই যায় না।

সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে হাঁটতে শুরু করে মল্লিকা নির্জন রাস্তা ধরে। মাথার উপরে শীতের আকাশটা কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হয়।

দূরে দূরে পথের আলোগুলো জ্বলছে।

মাত্র তিনরাত্রি আগে এমনি করেই একাকী রায়বাড়ির খিঁড়কীর দরজাপথে সে পথে এসে নেমেছিল, আজ আবার আবাল্যের নীড় ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াল।

সে রাত্রে সামনে তবু একটা আশ্রয়ের নিশ্চিত আশ্বাস ছিল কিন্তু আজ আর তার সেটুকুও নেই। সামনে পেছনে সব শূন্য।

কোন আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি নেই। আশ্বাস নেই।

সত্যি কি বিচিত্র ভাগ্য তার!

স্টেশনে এসে যখন পৌঁছল কলকাতাভিমুখী একটা ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে—তাড়াতাড়ি একটা কলকাতার টিকিট কেটে একটা সেকেণ্ড ক্লাস লেডিজ কামরায় উঠে বসে মল্লিকা।

একটু পরেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

দেখতে দেখতে লক্ষ্ণৌ স্টেশনটা অনেক পিছনে পড়ে রইল—স্টেশনের আলোগুলো একে একে দৃষ্টিপথ থেকে মিলিয়ে গেল।

কামরাটার মধ্যে মাত্র জনা দুই যাত্রী ছিল। তারা দুজনেই কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল।

মল্লিকা জানালার কাঁচটা তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

রাতের পৃথিবী—ঘুমন্ত পৃথিবী।

ট্রেনটা মধ্যম গতিতে চলেছে। বার বার ঘটাং ঘটাং একঘেয়ে চাকার শব্দ।

কলকাতায় তো চললো সে—কিন্তু সেখানে গিয়েই বা কি করবে!

একবার মনে হয় মল্লিকার, আর কেন—মিথ্যে এই জীবনের বোঝাটা

টেনে বেরিয়ে আর লাভ কি।

পরিচয় নেই—স্বীকৃতি নেই—সমাজে দশজনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হলে যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন—

কেউ তাকে আপনার বলে গ্রহণ করবে না।

মুখে না বললেও মনে মনে নিশ্চয়ই ঘৃণা করবে। বলবে, নাম গোত্র পরিচয় হীন একটা জারজ সন্তান।

ঐ তিন অক্ষরের ছোট্ট একটা কথার মধ্যে যে এমন ঘৃণা—এমন অপমান এমন একটা লজ্জা জড়িয়ে থাকতে পারে এমনি করে নিজেকে দিয়ে উপলব্ধি না করলে হয়ত সে কোন দিনই বুঝতে পারত না।

আচ্ছা এই চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়!

সমস্ত চিন্তা—সব জ্বালা ও অপমানের শেষ।

জানালাপথে বাইরের মুক্ত প্রকৃতির দিকে তাকাল মল্লিকা।

কি সুন্দর জ্যোৎস্না—

উগ্রতা নেই—আছে যেন একটা চন্দনের স্নিগ্ধতা, কি সুন্দর।

পৃথিবী কত সুন্দর।

এই সুন্দর পৃথিবীতেও সে বাঁচবারই স্বপ্ন দেখে এসেছে এতদিন।

তবে—তবে তার মৃত্যুর কথা মনে আসছে কেন, কেন—

না, না—। কেন—কেন তা সে করতে যাবে! যে জন্মের জন্য সে এতটুকু দায়ী নয় সেটাকেই সে তার সর্বাপেক্ষা বড় দায় বলে মেনে নিতেই বা যাবে কেন?

কত স্বপ্ন ছিল তার জীবনে!

বালিকা থেকে কৈশোর—কৈশোর কাল থেকে যৌবন কত আশার মুকুল ধীরে ধীরে তার জীবনে পাপড়ি মেলেছে—

কোন তার মূল্য নেই। সব ব্যর্থ—সব মিথ্যা—

না—এ হতে পারে না।

এমনি করে তার হার মেনে নেওয়া চলতে পারে না।

মরবে না সে—

মরতে সে পারে না।

কিন্তু কলকাতায় গিয়ে উঠবে কোথায় ?

হঠাৎ মনে পড়লো রমলার কথা—লক্ষ্মৌ কলেজে একসঙ্গে বছর দুই পড়েছিল—বি. এ. পাস করে মাত্র কিছুদিন আগে সে কলকাতায় এম. এ. পড়তে গিয়েছে।

একটা উইমেন হস্টেলে সে থাকে।

ঠিকানাটা মল্লিকার জানা।

স্থির করলো আপাততঃ রমলার ওখানেই গিয়ে উঠবে।

বালীগঞ্জ—গড়িয়াহাটায় হস্টেলটা।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে একটা ট্যাক্সী করে—ড্রাইভারকে সে ঠিকানাটা দিল।

বেলা তখন মাত্র সাতটা।

রমলার সেদিন দুপুরের দিকে ক্লাস।

হস্টেলের সামনে পৌঁছে ট্যাক্সীর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মল্লিকা একটি মেয়ের কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে দোতলায় রমলার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রমলা টেবিলের সামনে বসে একটা নোট দেখে ফেয়ার কপি করছিল—পদশব্দে স্যুটকেস হাতে মল্লিকাকে ঢুকতে দেখে সে অবাক!

একি মলি—তুই—

স্যুটকেসটা একপাশে নামিয়ে রেখে মল্লিকা বলে, হ্যাঁ—মল্লিকাই তার সামনে। ভূত নয়—

কি আশ্চর্য! কিন্তু এ সময় তুই কোথা থেকে—

হ্যাঁ, ভূত না হলেও বলতে পারিস যমালয় থেকে—

যমালয় থেকে ?

তাই—মনে মনে মরে গিয়ে যখন আবার ফিরে এসেছি তখন যমালয় থেকেই বৈকি—

না, না—সত্যি ব্যাপার কি বল তো ?

কিসের কি ব্যাপার!

কিছুদিন আগে চিঠিতে লিখলি তোর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গিয়েছে—

হ্যাঁ—তা হয়েছিল বলেই তোকে জানিয়েছিলাম।

তবে—বিয়ে হয় নি?

হয়েছিল—

হয়েছিল তার মানে?

হয়েছিল আবার হলোও না—

মানে?

সে এক রীতিমত মজার ব্যাপার—এসেছি যখন সবই বলবো—শুনবি—আপাততঃ ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে, এক কাপ চা খাওয়া দেখি—

রমলা বাইরে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে এলো।

একাই থাকিস তুই এ ঘরে!

আপাততঃ—

কেন ঐ দ্বিতীয় শয্যাটি?

আমার রুম-মেটটি বিবাহ করে স্বামীর সংসারে গিয়ে ঢুকেছে—চাকরিতে ইতি টেনে—

চাকরি থেকে একেবারে সত্যিকারের দাসীত্বে প্রমোশন!

যা বলিস—,

মেসের চাকর গোবিন্দ চা নিয়ে এলো। দু'হাতে দুটো কাপ।

ঐ টুলটার ওপর রেখে যাও গোবিন্দ, রমলা বললে।

নিঃশব্দে চায়ের কাপ দু'টো ছোট একটা চৌকো টেবিলের ওপরে নামিয়ে দিয়ে গোবিন্দ ঘর থেকে চলে গেল।

রমলা কিন্তু তার কৌতূহলটা বেশীক্ষণ চেপে রাখতে পারে না।

চা পান করতে করতেই পুনরায় প্রশ্ন করে, চেহারাটি দেখে তোর মনে হচ্ছে—

কি মনে হচ্ছে?

কতকাল যেন স্নান করিস না—চোখ-মুখের যা চেহারা করেছিস, চোখের কোল বসে গেছে—ব্যাপারটা কি বল তো?

ব্যাপার আর কি!

সে তুই যতই চাপা দেবার চেষ্টা করিস—তারপরই স্বরটা নামিয়ে

রমলা বলে, সিঁথিতে এখনো মনে হচ্ছে যেন সিঁদুরের চিহ্ন রয়েছে।

হঠাৎ বলে মল্লিকা, বিয়ের রাত্রে বাসর থেকে পালিয়ে এসেছি যে!

সে আবার কি!

কেন আসতে পারি না?

না, না—তা নয়—

তবে?

ঐ তো বললাম—।

সত্যিই পালিয়ে এসেছিস নাকি?

বললাম তো!

তা পালিয়ে আসতে গেলি কেন?

বিয়ের পর বাসরঘরে ঢুকে হঠাৎ বর মশাই আমার কথা নেই বার্তা নেই হুক্কা-হুয়া করে ডাকতে শুরু করে দিল—

বলিস কি!

তাই—

পাগল নাকি!

শুনলাম ভদ্রলোক নাকি তাই—

সর্বনাশ। তোর বাবা কি ভাল করে খোঁজখবর নেন নি বিয়ের আগে?

বাবাও নেন নি—তারাও দেয় নি।

তারা না হয় না দিয়েছে—তুই তো আর পাগল নোস?

পাগল নই তবে পাগলের এক কাঠি বাড়া—তাদের ছেলেটা তবু পাগল কিন্তু আমার পরিচয়েরই কোন বালাই নেই। বলতে বলতে হঠাৎ হেসে ফেলে মল্লিকা, রীতিমত একটা নাটকীয় ব্যাপার, তাই না?

রমলা যেন মল্লিকার কথাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

তাই কি জবাব দেবে মল্লিকার কথায় বুঝতে পারে না। কেমন যেন অসহায়ের মত মল্লিকার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

ব্যস্ত হোস না সবই জানতে পারবি—আপাততঃ তোর এখানে কটা দিন আমি থাকতে চাই রমলা।

তা বেশ তো থাক না।

হস্টেল সুপারিনটেনডেণ্ট্কে তোর জানাতে হবে তো ?

সে বললেই হবে'খন।

হবে'খন নয়—তুই গিয়ে বলে আয়—ততক্ষণ স্নানের ঘরটা আমায় দেখিয়ে দে আমি একটু স্নান করতে চাই—

দোতলাতেই বাথরুম আছে—

চল স্নানটা সেরে নিই তাহলে—বলতে বলতে মল্লিকা উঠে পড়ল—আপাততঃ প্রসঙ্গটায় একটা যেন পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে।

॥ ১৫ ॥

ভবানী দেবী সুহাসের পরামর্শ মত তাকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতেই উঠলেন।

পরের দিনই ডাঃ দে এলেন—

অসিতের চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। ঠিক হলো সুহাসই দেখা-শোনা করবে প্রত্যহ—প্রয়োজন মত ডাঃ দে পরামর্শ দেবেন।

কটা দিন ধরে অসিতের চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকলেও, সুহাস কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও মল্লিকার কথা ভুলতে পারে নি।

সেই যে সেদিন দুন এক্সপ্রেসে মল্লিকাকে তুলে দিয়ে এলো, তার পর আর তার কোন সংবাদই নেই।

এদিকে অসিতের ব্যাপারটাও মহেন্দ্রনাথকে ভাল ভাবে জানানো দরকার।

সুহাস দুদিনের জন্য লক্ষ্ণৌ চলে গেল।

সেখানে পৌঁছে দেখে মহেন্দ্রনাথ যেন কেমন পাগলের মত হয়ে গিয়েছেন এবং এও শুনলো মল্লিকা যেদিন লক্ষ্ণৌয়ে এসে পৌঁছয় সেইদিন গভীর রাত্রে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে—কোথায় ?

জানি না সুহাস। একটা ছোট চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে—

চিঠিটা পড়ে সুহাস মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না—

বলে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

রজনীই তখন মল্লিকা শ্বশুরগৃহ থেকে লক্ষ্ণৌয়ে ফিরে আসবার পর যা ঘটেছিল সব একে একে সংক্ষেপে সুহাসকে বলে গেল।

সব শুনে সুহাস কেমন যেন বোবা হয়ে যায়।

মল্লিকা তাহলে ওর মেয়ে নয়?

না—

মহেন্দ্রনাথ তখন বলেন, আত্মহত্যা সে করবে না—সে মেয়ে নয় সুহাস। তুমি দেখো বাবা তাকে যদি খুঁজে বের করতে পার।

কোথায় সে যেতে পারে বুঝতে পারছি না মেসোমশাই। কলকাতায় কি তার জানাশোনা কেউ আছে?

যত দূর জানি কেউ নেই!

সেই দিনই সুহাস বিকেলের ট্রেনে আবার কলকাতার দিকে রওনা হলো।

কোথায় গেল মল্লিকা!

কোথায় যেতে পারে!

নানা চিন্তা সুহাসের মাথার মধ্যে ভিড় করতে থাকে।

মল্লিকাকে যতটুকু জানবার বা চিনবার অবকাশ হয়েছে সুহাসের—সে ঠিক সাধারণ একটি আজকালকার মেয়ের মত নয়।

রীতিমত সিরিয়াস্ টাইপের মেয়ে।

একে অসিতের ঐ ব্যাপার তার উপরে তার নিজের জন্মবৃত্তান্ত মল্লিকার নার্ভের উপরে যে কতবড় আঘাত করেছে সেটা যেন অনুমানেই বুঝতে পারছিল সুহাস।

এবং তাকে যে রীতিমত বিচলিত করেছে নিঃসন্দেহে নচেৎ মহেন্দ্রনাথের আশ্রয় ছেড়ে সে অমনি করে চিরদিনের মত বের হয়ে

আসতে পারত না।

সত্যিই ঐ মুহূর্তে সুহাস যেন মল্লিকার জন্য গভীর একটা বেদনা অনুভব করে।

নিবিড় ভাবেই মল্লিকার সঙ্গে সে একদিন মিশেছিল এবং মনে মনে মল্লিকাকে ঘিরে মধুর একটা স্বপ্নও সে রচনা করেছিল কিন্তু মুখ ফুটে স্পষ্ট করে কোন দিনই সে কথা সে মল্লিকাকে জানায় নি।

কারণ কেবল মল্লিকাই যে সিরিয়াস টাইপের মেয়ে ছিল তাই নয় সুহাসও সিরিয়াস টাইপের ছেলে।

তাই সে ভেবেছিল বিলেত থেকে ফিরে এসে জীবনের প্রতিষ্ঠার পথটা সুগম করে মল্লিকার কাছে প্রস্তাবটা সে উথাপন করবে।

কিন্তু সুযোগই এলো না।

বিলেত থেকে ফিরে হোটেল থেকে দেখা করতে গিয়েই মহেন্দ্রনাথের কাছে সে শুনলো মল্লিকার বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছে—

কিছুদিন পরেই বিবাহ।

কথাটা জানার পরই নিঃশব্দে সুহাস সরে এসেছিল দূরে।

মনে মনে বলেছিল, মল্লিকা সুখী হোক। সে সুখে থাক।

সেই মল্লিকার জীবনে যে এতবড় বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে পারে কোন দিন এ বুঝি সত্যিই সুহাসের স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

প্রথমটায় ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গিয়েছিল পরে ভবানী দেবীর প্রতি প্রচণ্ড একটা আক্রোশে যেন জ্বলে উঠেছিল।

সেই আক্রোশের জ্বালাতেই ছুটে গিয়েছিল সেদিন সুহাস ভবানী দেবীর কাছে।

কিন্তু ভবানী দেবী যেন তার ব্যক্তিত্ব ও মহানুভবতা দিয়ে সুহাসের সমস্ত আক্রোশকে মুহূর্তে নির্বাপিত করে দিলেন।

মাথা নীচু করে ভবানী দেবীর কাছ থেকে সেদিন অতঃপর যেন পালিয়ে আসার পথ পায়নি সুহাস।

এমনটি তো সে ঠিক আশা করে নি।

মল্লিকার বর্ণনার সঙ্গে তো ঠিক মিলল না কোথায়ও।

আর যাই করুন ভবানী দেবী প্রতারণা যে তিনি করেন নি বা করতে পারেন না এ সম্পর্কে সত্যিই যেন সুহাসের আর কোন দ্বিধাই ছিল না সেদিন।

তারপর অসিতের চিকিৎসার ব্যাপারে ভবানী দেবীর সঙ্গে আরো কটা দিন ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে—অসিতকে দেখে ডাঃ দের কথা শুনে কেন যেন বার বার মনে হচ্ছিল দুর্ভাগ্যক্রমে কোথায়ও যদি একটা ভুল হয়েও গিয়ে থাকে সেটা সংশোধনের উপায় এখনো তাদেরই আয়ত্তে আছে।

অসিত হয়ত আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

কারণ অসিতেরও অস্থিরতা চঞ্চলতা একটু একটু করে লোপ পেয়ে সে ক্রমশঃ তখন অত্যন্ত ধীর শান্ত হয়ে উঠছিল।

যদিও সে এখনো কারো সঙ্গে কথা বলে না।

কাউকেই চিনতে পারছে না।

স্বেচ্ছায় খায় না—জোর করে খাইয়ে দিতে হচ্ছে।

ডাঃ দেও সেই রকম আশ্বাসই দিয়েছেন সুহাসকে।

সুহাস তাই ভেবেছিল মল্লিকার জীবনটা হয়ত ব্যর্থ হয়ে যাবে না—আর যদি তেমন হয়ই—ডিভোর্সের রাস্তা তো খোলাই আছে।

ভবানী দেবী নিজেই তো পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে রজনী দাদুর মুখে একি শুনে এলো সে! মল্লিকা যে ধরনের মেয়ে এবং মল্লিকাকে যতদূর সে চেনে মল্লিকাই হয়ত এখন বেঁকে বসবে।

এখানে কোন রকম নিষ্পত্তিই সে মেনে নিতে চাইবে না।

কলকাতায় ফিরে এসেও দুটো দিন ভাবলো সুহাস সর্বক্ষণ কিন্তু কোন মীমাংসাই যেন খুঁজে পায় না, ভবানী দেবীর গৃহে প্রত্যহ যায় দুবার করে—

দু তিন ঘণ্টা করে সেখানে থেকে আসে—ভবানী দেবী ও মায়ার সঙ্গে গল্প করে অথচ সে নিজেও কিছু বলে না ভবানী দেবীও কিছু জিজ্ঞাসা করেন না।

যদিচ ভবানী দেবী জানতেন সুহাস ইতিমধ্যে ছুদিনের জন্য লক্ষ্ণৌ গিয়েছিল।

মনে হয় ছুজনাই যেন ছুজনার কাছ থেকে ঐ প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

কলকাতার বাড়িটা ভবানী দেবীর দোতলা হলেও উপরে নীচে অনেকগুলো বড় বড় ঘর। পিছনের দিকে খানিকটা প্রাচীর ঘেরা বাগানও আছে।

ছুটো বাড়ি কলকাতায় ভবানী দেবীর—একটা ভাড়া দিয়েছিলেন—এটা ভাড়া দেন নি।

তাঁর ইচ্ছা ছিল ছেলের বিয়ে দিয়ে এবারে মুর্শিদাবাদের বাড়ি থেকে এসে এখানেই বসবাস করবেন। সেইভাবেই আধুনিক সব আসবাবপত্রে সাজিয়েছিলেন।

একতলাটা সম্পূর্ণ খালিই পড়ে আছে।

দোতলার একটা ঘরে অসিতের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, অন্য একটা ঘরে ভবানী দেবী মায়াকে নিয়ে থাকতেন।

অসিত এখন শান্ত বটে কিন্তু খাবার ও ঔষধ খাওয়া নিয়ে রীতিমত যেন কসরৎ করতে হয়—মায়া যেন ক্রমশঃই হাঁপিয়ে পড়ছিল।

আর কেন যেন ইদানীং মায়াকেও অসিত সহ্য করতে পারছিল না।

ডাঃ দে চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

বলেন, সর্বক্ষণের জন্য একজন ভাল নার্সের দরকার সুহাস। তুমি ভাল দেখে অভিজ্ঞ একজন নার্স দেখ—

সুহাস একজন নার্স বহাল করল—একজন সমস্ত দিনের ও রাত্রের জন্য।

কিন্তু প্রথম দিনই দিনের নার্সকে নিয়ে বিভ্রাট বাধল।

অসিত বেশীর ভাগ সময়ই ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে হয় চুপচাপ বসে থাকে, না হয় শয্যার উপরে মাথা নীচু করে ঝিম দিয়ে বসে থাকে।

ভবানী দেবী আসেন—মায়া আসে।

অসিতের নাম ধরে ডাকেন ভবানী দেবী—মায়া ডাকে ছোড়দা বলে, কিন্তু অসিত ফিরেও তাকায় না ওদের দিকে বেশীর ভাগ সময়ই।

যদি বা কদাচিৎ কখনো তাকায়—সে দৃষ্টি যেন কেমন শূন্য, অর্থহীন।

খোকন, আমাকে তুই চিনতে পারছিস না বাবা, আমি তোর মা—

অসিত মাথাই তোলে না। মুখ তুললেও যেন মনে হয় সে মুখে কোন প্রাণের সাড়া নেই। কেবল একমাত্র সুহাসের বেলাতেই যেন কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়।

সুহাস অসিতের গায়ে হাত দেয়—তাকে পরীক্ষা করে—কোন বাধা দেয় না অসিত। আর কেউ তার গায়ে হাত দিলেই সে সঙ্গে সঙ্গে হাতটা তার ঠেলে ফেলে দেয়।

॥ ১৬ ॥

সকালবেলা নার্সকে নিয়ে এসেছে সুহাস—নার্সটির অল্প বয়স এবং বেশ সুন্দর দেখতে।

অসিতের ঘরে গিয়ে তাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছে—বুঝিয়ে দিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে ভবানী দেবীর সঙ্গে গল্প করছে।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে সুহাস ও ভবানী দেবী দুজনাই চমকে ওঠেন। ঝন ঝন্ একটা কাচ ভাঙ্গার শব্দ।

না, না—না—

অসিতের গলার স্বর।

ছুটে যায় সুহাস ঘরে। ঘর-ভর্তি কাচের টুক্‌রো। ভবানী দেবীও ছুটে এসে ঘরে ঢোকেন।

দূরে দাঁড়িয়ে নার্সটি কাঁপছে আর অল্প দূরে দাঁড়িয়ে অসিত একটা টেবিল ক্লথ টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ছে।

কি—কি হয়েছে অসিত—কি হলো? ভবানী দেবী শুধান।

অসিত বলে ওঠে, বিষ—বিষ!

বিষ! কোথায় বিষ?

সুহাস প্রশ্ন করে।

ঐ গ্লাসে বিষ ছিল—আমাকে ও বিষ দিতে এসেছিল—আমি খাবো না—খাবো না—

সুহাস নার্সের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, আপনি ওঁকে বিষ দিতে এসেছিলেন? যান—যান আপনি এখান থেকে—

নার্স তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

সুহাস এবারে অসিতের দিকে তাকিয়ে বলে, ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি—আর ও বিষ দিতে পারবে না।

ছেলেমানুষের মত অসিত প্রশ্ন করে, বিষ দেবে না?

না—

কিন্তু আমি জানি দেবে—সুযোগ পেলেই দেবে—অসিত বলে।

না, না—দেবে না। আসুন—বসুন তো এই চেয়ারটায়—সুহাস অসিতের হাত ধরে এনে চেয়ারটার উপর বসিয়ে দেয়।

ধীরে ধীরে অসিত শান্ত হয়—আবার চুপচাপ।

ঐ নার্সকে অসিত সহ্য করতে পারবে না। অতএব ওকে রেখে আর তো কোন লাভ নেই—তাছাড়া নার্সও থাকতে চায় না আর। বলে, না এখানে আমি কাজ করতে পারবো না ডাক্তারবাবু।

নার্সকে বিদায় করে দেয় সুহাস তার চুক্তিমত ফিস দিয়ে।

দ্বিপ্রহরে ডাঃ দে-কে কথাটা বলায় তিনি বললেন, তবে তো মুশকিল হলো সুহাস—অথচ নার্সিংয়ের জন্য একজন নার্স দরকারই—

দেখি, যত দিন না একটা ব্যবস্থা হয় যতটা পারি আমিই ওর সেবা করব—আর মায়া তো আছেই—

হ্যাঁ মায়া আছে বটে, সুহাসের কথার জবাবে বলেন ডাঃ দে, কিন্তু সে তো ঠিক ট্রেণ্ড্ নার্স নয়, তাছাড়া তোমার উপরেও অত্যন্ত স্ট্রেন পড়বে—

তা পড়ুক স্যার—তবু যদি ওকে আমি সুস্থ করে তুলতে পারি—a quite intelligent bright young man—কোথায় মনের মধ্যে একটা সামান্য কিসের জন্য ঠিক স্বাভাবিক—normal নয়—ভাবতেও আমার কষ্ট হয় স্যার—

ডাঃ দের সঙ্গে আবার কিছুক্ষণ ধরে পরামর্শ করে তাঁর চেম্বার থেকে সুহাস বের হয়ে এলো।

আশ্চর্য!

অসিত তো তার কেউ নয়—কোন সম্পর্কই তার সঙ্গে নেই—তবু মনে হচ্ছে ওকে সুস্থ করে তোলা যেন তার একটা দায়িত্ব।

গত কয়দিন ধরে অসিতকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে পর্যবেক্ষণ করে করে কতকগুলো ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছিল—তার ঐ ছবি আঁকা—পুতুল প্রীতি—তার মনে হয়েছে, যুবা হলেও অসিতের মনের মধ্যে যেন কোথায় একটা শিশুভাব রয়েছে।

মার্কেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে সুহাস অনেকগুলো পুতুল কিনল—ছবি আঁকবার সাজসরঞ্জাম কিনল, তারপর অসিতের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো।

অসিত তার ঘরের মধ্যে বসে ছবি আঁকছিল।

প্যাকেটগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ডাকল সুহাস, অসিতবাবু—

অসিত মুখ তুলে তাকাল। তার মুখে একটা খুশির ঢেউ যেন ছড়িয়ে পড়ে।

দেখুন—কি এনেছি—

একে একে সুহাস খেলনাগুলো বের করে দেয়, সুন্দর না—

অসিত মুখে কিছু বলে না বটে তবে খেলনাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে তার চোখে-মুখে যে খুশির ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা সুহাসের তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি এড়ায় না।

এক সময় সুহাস প্রশ্ন করে, খেয়েছেন?

না।

এখনো খান নি—ক্ষিদে পায় নি?

না—

দাঁড়ান, আমরা একসঙ্গে খাবো।

অসিত বাইরে গিয়ে মায়াকে বলে আসে দুপ্রস্থ খাবার দেবার জন্য—একটু পরে মায়া খাবার নিয়ে আসে এবং সুহাসের ইঙ্গিতে ডিস দুটো রেখে চলে যায়।

নিন খান—

অসিতের হাতে একটা প্লেট তুলে দেয় সুহাস।

সুহাসও একটা প্লেট তুলে নেয়, খেতে শুরু করে, বলে, কই খান—

আশ্চর্য!

অনেক দিন পরে আজ অসিত কাঁপা-কাঁপা হাতে একটা একটা করে খাবার প্লেট থেকে তুলে খেতে থাকে। দরজার আড়াল থেকে ভবানী দেবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন।

চোখের কোল দুটি তাঁর জলে ভরে আসে।

একটু পরে সুহাস যখন পাশের ঘরে আসে ভবানী দেবী বলেন, গত জন্মে তুমি আমার পেটের ছেলে ছিলে বাবা—

শুধু তাই নয় মা—অসিতবাবুও বোধ হয় আমার মায়ের পেটেরই ভাই ছিলেন। সুহাস বলে। তার পর একটু থেমে বলে, ওসব কথা এখন থাক মা! যা দেখছি—একজন সেরকম নার্স না পাওয়া পর্যন্ত আমাকেই ওকে দেখাশোনা করতে হবে—তাই ভাবছি—

আমি বলছিলাম কি, খুব যদি তোমার অসুবিধা না হয় তো এখানেই তুমি থাক না বাবা?

তাই ভাবছি—

তাই থাক বাবা—

কিন্তু—

আমি আজই মায়াকে বলে তোমার ঘর ঠিক করে দিচ্ছি—জানি এখানে থাকলে ক্ষতি হবে তোমার নিজের প্র্যাকটিসের—

একটু ক্ষতি হবে। তা আর কি করা যাবে—ন'টা নাগাদ বের হয়ে যাবো—দুপুরে আবার ফিরে আসবো—বিকেলে যাবো আবার রাত্রে

আসবো।

এত পরিশ্রম—

কিছু না মা। ডাক্তারদের পরিশ্রমের কথা কি ভাবতে গেলে চলে—আপনি কিছু ভাববেন না মা—আমার কোন অসুবিধা হবে না।

ঐ দিনই সুহাস তার ফ্ল্যাট থেকে একটা সুটকেসে আবশ্যকীয় জিনিসপত্রগুলো ভরে বেহালার বাক্সটা নিয়ে ভবানী দেবীর বাড়িতে উঠে এলো।

দোতলাতেই মায়া একটা ঘর গুছিয়ে রেখেছিল করালীর সাহায্যে।

দক্ষিণমুখী ঘরটা—পিছনের দিকের জানালা দিয়ে তাকালেই বাগানটা চোখে পড়ে।

ঘরের মধ্যে পা দিয়ে সুহাস বলে, এ কি করেছেন মায়া দেবী—

কেন!

এ যে কোন নামকরা হোটেলের সুইট্ বলে মনে হচ্ছে—

বাঃ, একটা মানুষ থাকবে—

মায়া দেবী, আপনি জানেন না—অতি ছোটবেলা মা-বাবাকে হারিয়ে জীবন-সংগ্রামের মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হয়েছিল—মামার আশ্রয় একটা পেয়েছিলাম বটে, সে কেবলমাত্র মাথা গুঁজবার ঠাঁই ছাড়া আর কিছু নয়—সন্ত বহুকষ্টে কিছু ডিগ্রী নিয়ে বিলেত থেকে ফিরে সবে জীবনসংগ্রাম আবার শুরু করেছি—এ বিলাসিতায় যে আমি হাঁপিয়ে উঠবো—দয়া করে আপনি আমাকে অন্য একটা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিন—

এসবের কিছুই কিন্তু আমার নয় সুহাসবাবু—সব মা দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছেন আমাকে দিয়ে—

কিন্তু—

মা মনে দুঃখ পাবেন।

কি জানি কেন অতঃপর সুহাস আর কিছু বলতে পারে না।

আপনি বসুন আমি চা নিয়ে আসি—

অসিতবাবু কি করছেন ?

আপনি যে সব রং তুলি এনে দিয়েছেন—তাই নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকছে ছোড়দা।

মায়া ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

চা নিয়ে ফিরে এসে দেখে সুহাস বাক্স থেকে তার বহুদিনের অব্যবহৃত বেহালাটা বের করে একটা রুমাল দিয়ে যত্ন করে পুঁছছে।

আপনার বুঝি গানবাজনারও শখ আছে ?

এককালে ছিল—মেসোমশাইয়ের কাছে শিখেছিলাম—তারপর বিলেতে গিয়ে আমার যে রুমমেট জুটে গেল সে একজন চমৎকার ভায়োলিনিস্ট—তার কাছে কিছু লেসন নিয়েছিলাম। তার পর বিলেত থেকে ফিরে এসে এতদিন এটা তোলাই ছিল বাক্সবন্দী হয়ে। আচ্ছা মায়া দেবী—

বলুন—

অসিতবাবুর বাবা শুনেছি একজন খুব বড় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন ?

হ্যাঁ।

অসিতবাবুর মধ্যে তার কিছু বর্তায় নি ?

না।

আশ্চর্য! অথচ—

কি ?

মার কাছে শুনেছি অসিতবাবুকে তার বাবা নাকি খুব ভালবাসতেন!

হ্যাঁ—শুনেছি ছোড়দাও পিসেমশাইকে নাকি খুব ভালবাসত।

॥ ১৭ ॥

মল্লিকা স্থির করেছিল একটা যা হোক চাকরি সে জুটিয়ে নেবে।

সে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির সন্ধানে ফিরতে লাগল।

সেদিন দুপুরে মেডিকেল কলেজের কাজ সেরে সুহাস ফিরছে হঠাৎ বাসে আসতে আসতে মল্লিকাকে দেখতে পেল।

মল্লিকা ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছিল।

তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে দ্রুত হেঁটে গিয়ে মল্লিকাকে ধরে সুহাস।

মলি—

কে—সুহাস।

কোথায় চলেছো?

এই একটু এদিকে। আচ্ছা চলি—

মল্লিকা সুহাসকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু সুহাস তার পথ আগলে দাঁড়ায়, শোন—শোন তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল মল্লিকা—

আমি একটু ব্যস্ত আছি সুহাস।

বেশ তো—যেখানে তুমি যেতে চাও আমি তোমাকে পৌঁছে দেবো'খন।

তার চেয়ে বরং তুমি তোমার ঠিকানাটা আমাকে দাও, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।

না—

বলেই সুহাস একটা চলমান ট্যাক্সিকে হাত-ইশারায় ডাকতেই ট্যাক্সিটা ওদের পাশে এসে দাঁড়াল।

ট্যাক্সিওয়ালা দরজা খুলে দেয়।

চল—ওঠো ট্যাক্সিতে—

মল্লিকা একবার কঠিন দৃষ্টিতে সুহাসের মুখের দিকে তাকাল মুহূর্তের জন্য, কি যেন ভাবল, তার পর আর আপত্তি করল না।

ট্যাক্সিতে উঠে বসল সুহাসের সঙ্গে।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে ? ইংরাজীতেই মল্লিকা সুহাসের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

সুহাস বলে, আমি কোথাও তোমাকে নিয়ে যেতে চাই না। তুমি কোথায় যাবে বল ? সুহাসও ইংরাজীতে কথা বলে।

আমার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, মল্লিকা বলে, কি তোমার কথা ছিল বলছিলে বল ?

কোথায় তুমি আছো এখানে ?

কি হবে জেনে ?

জানাতে আপত্তি আছে কিছু আমাকে ?

না।

তবে ?

গড়িয়াহাটার কাছে এক উইমেন হস্টেলে আছি—

সেই হস্টেলেই কি এখন যাবে ?

গেলেও চলে না গেলেও চলে।

সুহাস তখন তার বাসার ঠিকানাটা বলে দেয় ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তারপর মল্লিকাকে শুধায়, এদিকে কোথায় গিয়েছিলে ?

একটা চাকরির খোঁজে—

চাকরি ?

হ্যাঁ।

তা হঠাৎ চাকরির কি প্রয়োজন পড়ল তোমার ?

প্রয়োজন পড়েছে বৈকি। নচেৎ খাবো কি—মাথা গোঁজবার মত একটা ঠাঁই চাই, সেটারও তো ভাড়া মাস গেলে দিতে হবে। তার পরই একটু থেমে ডাকে, সুহাস—

কি ?

আমাকে একটা চাকরি দেখে দাও না। টিউশন নিতেও রাজী আছি—একটা, দুটো—তিনটে—

বেশ—চেষ্টা করে দেখবো। কিন্তু একটা কথা বলছিলাম।

কি ?

আমার বাসাটা আপাততঃ খালিই পড়ে আছে।

খালিই পড়ে আছে মানে ?

হ্যাঁ—একটা হোলটাইমের বলতে গেলে চাকরি নিয়েছি—সেই-খানেই থাকতে হয়, তাই বলছিলাম হস্টেলে না এসে ঐখানেই তুমি এসে এখন থাক না কিছুদিন। মিথ্যে একটা হস্টেলের ভাড়া টানবে কেন ? তারপর চাকরি হলে না হয় যেখানে হোক চলে যেও। কি বল, আপত্তি আছে ?

মল্লিকা মনে মনে ভাবছিল—আজকালকার দিনে হস্টেলের খরচটা নেহাৎ কম নয়। হাতে তার সামান্যই পুঁজি। গত আট-দশ দিনের থাকা-খাওয়ার খরচ কম হয় নি।

কি ভাবছো ?

কিন্তু—

আমার বাসাটা খালি পড়ে আছে, সেখানে ক'টা দিন তুমি থাকবে তার মধ্যে কিন্তু করছো কেন, বেশ তো এতই যদি কিন্তু, তোমার চাকরি পেলে না হয় ক'দিনের ভাড়া দিয়ে দিও।

মল্লিকা মৃদু হাসে।

তাহলে চলো মলি—হোস্টেলে গিয়ে তোমার জিনিসপত্রগুলো তুলে নিই—

এখুনি !

ক্ষতি কি ?

কিন্তু—

সে কিন্তুতে আর কান দেয় না সুহাস, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গড়িয়া-হাটার দিকে গাড়ি চালাতে বলে।

কিন্তু একটা কথা বোধহয় আমার সম্পর্কে জানা দরকার সুহাস—আমার তোমার ওখানে যাওয়ার আগে—

কি কথা ?

কেন আমি লক্ষ্ণৌ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি—

আমি জানি। শান্ত গলায় জবাব দেয় সুহাস

জান ?

জানি—তুমি লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আসার পরই আমি লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম যে—

তুমি লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ।

মল্লিকা আর কোন কথা বলে না।

দ্বিপ্রহরের শীতের খর রৌদ্রতাপে শহরটা যেন ঝলসে যাচ্ছে। দ্বিপ্রহর হলেও যানবাহন ও মানুষ-জনের ভিড়ের কমতি নেই কিছু।

দোকানে দোকানে বেচা-কেনাও চলেছে।

অন্যমনস্ক মল্লিকা সেই চলমান জীবনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মলি—

উঁ—

জান আমি মুর্শিদাবাদে তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে-ছিলাম—কিন্তু তিনি সেই গহনাগুলো ফেরত নেননি।

কেন ?

বললেন তিনি একবার যা তাঁর বৌমাকে আশীর্বাদী দিয়েছেন তা তিনি আর ফিরিয়ে নিতে পারেন না।

আশীর্বাদী আবার কি—যে বিয়ে বিয়েই নয়—

তাছাড়া ভদ্রমহিলা বলেছেন তোমার যে ক্ষতি তিনি করেছেন তার সমস্ত ক্ষতিপূরণ তিনি করতে প্রস্তুত।

ক্ষতিপূরণ ?

হ্যাঁ।

কিন্তু সুহাস, পৃথিবীতে সব ক্ষতির পূরণই কি সবাই করতে পারে, না তাই কিছু সম্ভব। তাছাড়া তাঁর আর লজ্জার তো কোন কারণই নেই। তিনি যেটুকু প্রতারণা করেছেন বা মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে-ছিলেন, তার চাইতে কম প্রতারণা ও মিথ্যা তো আমরা করিনি।

ইতিমধ্যে হস্টেলের কাছাকাছি গাড়িটা এসে গিয়েছিল।

মল্লিকা ড্রাইভারকে বাঁ দিকে ঘুরতে বলে।

হস্টেলের সামনে ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে উপরে চলে যায় মল্লিকা।

রমলা ঘরেই ছিল—তার ক্লাস ছিল না সেদিন।

কি রে কিছু হলো? রমলা শুধায়।

না—হওয়াটা কি এত সহজ নাকি রে,—দাঁড়া, জুতোর শুকতলা কটা ছিঁড়ুক—তৈলাভাবে মাথার চুল রুক্ষ হোক—পেট চোঁ চোঁ করুক, মাথা ঘুরুক, তবে না—বলতে বলতে মল্লিকা সুটকেসের মধ্যে তার জামা কাপড়গুলো ভরতে থাকে।

রমলা বিস্ময়ের সঙ্গে শুধায়, ও কিরে! ওসব আবার সুটকেসে ভরছিস কেন?

চলে যাচ্ছি—

কোথায়?

একজন জানা লোকের ওখানে!

ওঃ।

তোর এই কয়দিনের খরচ কত হয়েছে বল তো?

কেন, দিবি?

বাঃ, দিতে হবে না—

লজ্জা করলো না তোর কথাটা বলতে মলি!

বাঃ, কি বলছিস তুই—তুই কি চাকরি করিস নাকি?

নাই বা করলাম—ধর আমিই যদি তোর হস্টেলে গিয়ে দুদিন থাকতাম তুই থাকা-খাওয়ার খরচ নিতিস না কি—

কিন্তু ভাই—

ঐ সময় ট্যাক্সির হর্ণ শোনা যায়—সুহাস তাগাদা দিচ্ছে।

যা—ট্যাক্সি হর্ণ দিচ্ছে—বোধহয় তোর—

মল্লিকা আর দাঁড়ায় না, সুটকেসটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

মল্লিকাকে নিজের বাসায় রেখে চাকরটাকে বলে সুহাস চলে গেল।

অসিত হয়ত এখনো খায়নি।

সে ছাড়া তো কেউই তাকে এখনো বলতে গেলে প্রায় খাওয়াতেই পারে না। এখনো সে কাউকে যেন চিনতেই পারছে না।

ভবানী দেবীর গৃহে পৌঁছে দেখলো যা ভেবেছিল তাই।

অসিত কাঠ হয়ে বসে আছে।

খাবার নিয়ে মায়া ও ভবানী দেবা সাধাসাধি করে চলেছে।

সুহাসের পায়ের শব্দে ভবানী দেবী ও মায়া ফিরে তাকায়।

ভবানী দেবীই বলেন, এত দেরী হলো যে বাবা তোমার!

একটু কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম মা—তার পর মায়ার দিকে তাকিয়ে বলে, কই মায়া দেবী, আমার খাবারটাও পাঠিয়ে দিন—আমি হাত-মুখটা ধুয়ে আসি—

মায়া ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

একটু পরেই সুহাস অসিতকে নিয়ে খেতে বসল ঘরের মধ্যে পাতা ডাইনিং টেবিলে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে। এখন আর অসিত আপত্তি করে না। আস্তে আস্তে খেতে শুরু করে।

অসিতবাবু—

অসিত সুহাসের মুখের দিকে তাকাল।

মা অত করে বলছিলেন খেতে, খাচ্ছিলেন না কেন?

মা—

হ্যাঁ, আপনার মা।

আমার মা—

হ্যাঁ, আপনার মা, মা কত কষ্ট পেয়েছেন—

অসিত কোন কথা বলে না, মাথাটা নীচু করে একটু একটু খেতে থাকে।

হঠাৎ সুহাস ডাকে, মা—মা—

ভবানী দেবী দরজার বাইরেই ছিলেন, সুহাসের ডাকে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকেন—সুহাস নিঃশব্দে চোখের ইশারা করে ভবানী দেবীকে তার ছেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বলে।

ভবানী দেবী অসিতের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

মা—অসিতবাবুকে আর একটা চপ দিন না?

ভবানী দেবী একটা চপ তুলে অসিতের পাতে দেন। আশ্চর্য, অসিত কোন বাধা দেয় না।

ভবানী দেবী মৃদু কণ্ঠে শুধান, আর একটা দেবো খোকন?

অসিত চুপ করে থাকে।

নিন না অসিতবাবু, বেশ ভাল হয়েছে চপটা—দিন মা আর একটা।

অসিত ইতিমধ্যে আগের দেওয়া চপটা খেতে শুরু করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলো না—হাত গুটিয়ে নিল।

কি হলো, খাবেন না?

অসিত কোন জবাব দেয় না, হঠাৎ ঠেলে দেয় খাবারের প্লেটটা—জলের গ্লাস উল্টে পড়ে।

ভবানী দেবীকে সুহাস চোখের ইশারা করে, ভবানী দেবী ঘর থেকে বের হয়ে যান।

সুহাস অসিতকে আবার খাওয়াবার চেষ্টা করে কিন্তু অসিত খাবে না কিছুতেই।

সুহাস আর বেশি পীড়াপীড়ি করল না—বাথরুমে নিয়ে গিয়ে তার হাত ধুইয়ে দিল। তারপর ছবি আঁকবার খাতাটা ও পেনসিল ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, ছবি আঁকতে পারেন?

অসিত গুম্ হয়ে বসে থাকে।

আপনি তো খুব ভাল ছবি আঁকতে পারেন। আঁকুন না—

সুহাস খাতাটায় একটা প্রজাপতি এঁকে দেখায় অসিতকে।

অসিত পেনসিলটা নিয়ে খাতায় হিজিবিজি আঁকতে থাকে।

সুহাস ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

নিজের ঘরে ঢুকে দেখে জানালাটার সামনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন ভবানী দেবী।

মা—

ভবানী ফিরে তাকালেন।

ও বোধ হয় আর ভাল হবে না সুহাস!

আপনাকে তো বলেছি মা—নিশ্চয়ই উনি ভাল হয়ে উঠবেন—

কিন্তু এখনো তো আমাকে মনে হয় চিনতেই পারছে না—

একেবারে যে চিনতে পারছেন না তা নয়। একটু একটু করে চিনতে পারছেন। সামান্য যেটুকু ঝাপ্সা ঝাপ্সা আছে ক্রমশঃ তা কেটে যাবে।

হয়ত যাবে, কিন্তু আবার যে ওরকম হবে না তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই বাবা—

সেটা যাতে আর না হয় সেটাই আমায় দেখতে হবে মা।

তা কি সম্ভব!

নিশ্চয়ই সম্ভব বৈকি। আপনাকে তো সেদিনও আমি বলেছি, সুন্দরী সুবেশা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অসিতবাবুর মনের মধ্যে কোথায় একটা দ্বন্দ্ব আছে—সেই দ্বন্দ্ব কেন—কি থেকে হলো সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, আর তা যদি বের করতে পারি উনি চিরদিনের মত সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন আর ঠিক দশজন মানুষের মত।

কি জানি সুহাস, কেন যে ওর এমনটা হলো—

কারণ একটা আছে বৈকি মা—তারপর একটু থেমে ডাকে, মা—

কিছু বলছিলে!

হ্যাঁ—মল্লিকার সঙ্গে আমার দেখা হলো!

মল্লিকা! কোথায় সে?

কলকাতায় এসেছে।

তুমি যে বলেছিলে সে লক্ষ্ণৌ গিয়েছে—তার বাবার কাছে—

গিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে সে চলে এসেছে—

চলে এসেছে !

হ্যাঁ।

ভবানী দেবী চুপ করে থাকেন।

আমার একটা কথা কি মনে হয় জানেন মা !

কি ?

মল্লিকার হাতে যদি অসিতবাবুর সেবার ভারটা তুলে দেওয়া যেত—তাহলে হয়ত মল্লিকার সাহচর্যে ক্রমশঃ সে একটু একটু করে তার মনের বর্তমান দ্বন্দ্বটা কাটিয়ে উঠতে পারত।

আমিও তো সেই কথা ভেবেই বিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এক ভাবলাম আর কি হয়ে গেল—

যা হয়েছে তা হয়ত ভালর জন্যই হয়েছে—আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন না যদি তাকে কোন মতে এখানে নিয়ে আসতে পারেন।

সে কি আসবে ?

হয়ত আসতেও পারে—আর যাতে আসে সেইভাবেই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া সে তো আপনারই পুত্রবধূ—

যে ব্যাপার ঘটে গেল তারপর কোন্ মুখ নিয়েই বা তার কাছে গিয়ে আর দাঁড়াবো—

বললাম তো, যা ঘটে গিয়েছে গিয়েছে—তাছাড়া তার মনের উপর দিয়েও কম ঝড় বয়ে যায়নি তারপর আপনি একবার—কাল পরশু তার কাছে যান।

কোথায় সে ?

সে আপাততঃ আমার বাসাতেই আছে।

তোমার বাসায় ?

হ্যাঁ—আপনি কাল পরশুই একবার যান মা—তাকে এনে আমার বাসায় তুলেছি বটে, তা তাকে তো জানি—থাকবে না সে—যে কোন মুহূর্তেই হয়ত চলে যাবে একটা কিছু চাকরি-বাকরির যোগাড় করতে পারলেই—

চাকরি !

হ্যাঁ—স্বাধীন ভাবে সে বেঁচে থাকতে চায়, তাই হন্যে হয়ে চাকরির খোঁজ করছে ।

চাকরি করবে—মল্লিকা চাকরি করবে—রায়-বাড়ির বৌ—না, না—তা তো হয় না সুহাস—আমার ড্রাইভার নাথু সিং তোমার বাসা চেনে না !

চেনে—

ভবানী দেবী আর কোন কথা বললেন না—ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন ।

একটা স্কুলে একটা টীচারের পোস্ট খালি আছে বেহালায়, একজনের কাছে গতকাল শুনেছিল মল্লিকা ।

মল্লিকা ঠিক করেছিল আজই বিকেলের দিকে সেখানে একবার যাবে । কারণ বিকেল না হলে স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা হবে না ।

বেলা সাড়ে তিনটে প্রায় বাজে, মল্লিকা উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে জুতোটা পায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরুতে যাবে—ঘরের বাইরে পদশব্দ পেয়ে চমকে মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাতেই মল্লিকা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় ।

এগুতে পারে না—দাঁড়িয়ে পড়ে ।

সামনেই দাঁড়িয়ে দরজা জুড়ে ভবানী দেবী ।

পরনে সেই দুধগরদের সাদা শাড়ি—গায়ের উপর একটা সাদা শাল ।

আপনি—

হ্যাঁ বৌমা—আমি ।

মল্লিকা অতঃপর ঠিক কি বলবে, কি করবে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না । পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে ।

তুমি সেদিন আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে চলে এসেছো,

তবু তোমার কাছেই আমি এলাম মা।

কেন?

তোমাকে নিয়ে যাবো বলে—চল মা—

কোথায়?

তোমার বাড়িতে।

আমার বাড়ি?

হ্যাঁ—বিয়ের পর শ্বশুরগৃহই তো মেয়েদের আসল ও একমাত্র বাড়ি। চল মা—আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছি—

সেজন্য তো আমার মনে এতটুকুও আর ক্ষোভ নেই।

আছে বৈকি মা—আর থাকাটা তো অন্যায় নয়—অত্যন্ত স্বাভাবিক।

না—আপনি বিশ্বাস করুন, কোন ক্ষোভ আপনাদের প্রতি আর আমার নেই—বরং সেদিনকার আমার ব্যবহারের জন্য আমিই দুঃখিত, লজ্জিত।

না মা—তুমি দুঃখিত লজ্জিত হবে কেন—ছেলে তো আমার সত্যিই একেবারে সুস্থ-স্বাভাবিক ছিল না—আর সে কথা গোপন করেই তোমার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলাম—কারণ বাগচী মশাই তোমাদের কোষ্ঠীবিচার করে বলেছিলেন তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে ছেলে আমার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে—নিজের ছেলের কথাটাই ভেবেছি স্বার্থপরের মত। একটিবারও তোমার কথা ভাবিনি—সেজন্য যদি কারো দুঃখিত ও লজ্জিত হতে হয় সে তো আমারই।

ওসব কথা থাক। আপনি দয়া করে পথ ছাড়ুন—আমার বিশেষ কাজ আছে আমাকে একটু এখুনি বেরুতে হবে—

চাকরির সন্ধানে বোধহয়?

তাই—আমাকে যেতে দিন—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—

ভবানী দেবী যেন মুহূর্তকাল কি ভাবলেন তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, চাকরিই যদি তোমার একমাত্র কাম্য হয় তুমি এক কাজ কর না—আমি তোমাকে চাকরি দেবো—চল আমার সঙ্গে—

আপনি চাকরি দেবেন!

শোন মা, অসুস্থ অসিতকে নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শে আমি কলকাতায় এসেছি—তাকে দেখাশোনা করবার জন্য সর্বক্ষণের এমন একজন আমার প্রয়োজন—যে তাকে দরদ দিয়ে স্নেহ দিয়ে সেবা দিয়ে আবার তাকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে—সে কাজ তো সাধারণ একজন পয়সা দিয়ে আনা পরিচর্ষাকারিণীর পক্ষে সম্ভব নয়—যদি কারো দ্বারা সে কাজ সম্ভব হয় তো একমাত্র তোমার দ্বারাই হবে—

আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

না মা—তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না—আমার সঙ্গে চল—সে এখন আর সেদিনকার মত অস্থির চঞ্চল নেই, শান্ত—তাছাড়া আজ আর সে কাউকেই চিনতে পারছে না—এমন কি আমাকেও—

না।

তার মা হয়ে—অসুস্থ সন্তানের জন্য তোমার সেবাটুকু আমি ভিক্ষা চাইছি মা।

না—তা হয় না—

কেন হয় না! আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—একটি বছর তুমি আমার ওখানে থাক, তার মধ্যে যদি ছেলে আমার ভাল হয়ে ওঠে তো উঠল, নচেৎ তুমি যেখানে যেতে চাও চলে যেও—তোমার পথ আমি আটকাবো না।

না।

মল্লিকা—

না—বললাম তো তা আজ আর সম্ভব নয় কোন মতেই।

কেন—কেন সম্ভব নয়—

কারণ যাকে আপনি ডাকতে এসেছেন এত আগ্রহ করে তার সত্যকারের পরিচয়টা আজও আপনি জানেন না।

সত্যকারের পরিচয়?

হ্যাঁ—তার সত্যকারের পারচয়—যেটা আপনার কাছে গোপন করা হয়েছে—

গোপন করা হয়েছে! কি গোপন করা হয়েছে? তোমার পরিচয়?

হ্যাঁ, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরীর মেয়ে আমি নই—

হঠাৎ যেন কথাটা শুনে চমকে ওঠেন ভবানী দেবী। কয়েকটা মুহূর্ত তার গলা দিয়ে কোন স্বর বের হয় না।

তারপর একসময় কতকটা যেন আত্মগতভাবেই ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন, চৌধুরী মশাইয়ের মেয়ে তুমি নও?

না।

তবে কার মেয়ে তুমি?

তার স্ত্রীর এক ছোট বোন ছিল তারই মেয়ে আমি।

এই কথা—

না—শুধু তাইই নয়—আরো আছে।

আরো আছে?

হ্যাঁ—কিন্তু থাক্, সে কথা আপনি নাই বা শুনলেন।

না—বল তুমি—

শুনবেনই?

হ্যাঁ—শুনবো, বল—

তবে শুনুন—তার সেই ছোট বোন এক রাত্রে আমার জন্মদাতার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে—এখন বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই কেন আমার যাওয়া সম্ভব নয়।

তাতে কি হয়েছে! এমন তো কতই হয়—

হয় তো হয়—কিন্তু আমার জন্মদাতা কোনদিনই আমার মাকে সামাজিক ভাবে আইনমত বিবাহ করেন নি।

ভবানী দেবী যেন পাথর।

বোবা।

মল্লিকা বলতে থাকে, সমাজের চোখে তাদেরই অবৈধ সন্তান আমি! আমি যখন আমার মায়ের গর্ভে আমার জন্মদাতা তাকে ফেলে পালিয়ে যান। এক হাসপাতালে আমার জন্ম—জন্মের পরে মার মৃত্যু হয়

ভবানী দেবীর আকর্ষণে সে পা বাড়িয়ে গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ ভবানী দেবী মল্লিকার দিকে ফিরে বললেন, ঘোমটাটা তুলে দাও মা মাথায়—

কথাটা বলে মল্লিকার জন্য অপেক্ষা করলেন না ভবানী দেবী, নিজেই হাত বাড়িয়ে সস্নেহে মল্লিকার মাথায় আঁচলটা তুলে দিলেন।

ঐ দ্বিপ্রহরে হঠাৎ ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ি নিয়ে ভবানী দেবীকে বেরুতে দেখে করালী একটু যেন অবাকই হয়ে গিয়েছিল।

একে তো ভবানী দেবী বড় একটা বাড়ি থেকে বেরই হন না—তার উপরে ঐ দ্বিপ্রহরে একা একা বের হয়ে গেলেন গাড়ি নিয়ে।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে করালী তাই ছুটে এসেছিল দরজা খুলতে।

ভবানী দেবী আগে আগে শান্ত পায় হেঁটে আসছেন—তাঁর পিছনে—করালীর যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না—ঐ বাড়ির সেই বধূ, যে কিছুদিন আগে মধ্যরাত্রে প্রচণ্ড ঝগড়া করে বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভবানী জিজ্ঞাসা করেন, মায়া কোথায় রে করালী—

উপরে মা।

গাড়ির শব্দ মায়াও পেয়েছিল—সেও সিঁড়ির দিকে আসছিল। দূর থেকেই সে ভবানী দেবীর পিছনে মল্লিকাকে দেখতে পায়।

মল্লিকা এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল—এ সে বাড়ি নয়—প্রাচীন ঐতিহ্যে মোড়া সেই সেকেলে প্যাটার্ণের সুবিশাল রায়েদের প্রাসাদ নয় যার ঘরে ঘরে আজও প্রাচীন যুগটা খুঁটি গেড়ে বসে আছে একটা পাষাণস্তব্ধতা নিয়ে।

বিরাট বিরাট থাম—পঙ্খের কাজ করা খিলান—চওড়া কার্নিশ —নিরন্তর কবুতরের গুঞ্জন, শ্বেতপাথরের চওড়া সিঁড়ি যেখানে—কেমন যেন গা ছমছম করে উঠেছিল মল্লিকার—এ সে বাড়ি নয়।

সর্বক্ষণ একটা থম্‌থমে নির্জনতা—কেমন একটা শীতলতা যে বাড়ির কক্ষে কক্ষে এ সে বাড়ি নয়—এ বাড়ির দেওয়ালে চোখজুড়ানো ফিকে

নীল রং—দেওয়ালের গায়ে দুটো একটা ল্যাণ্ডস্কেপ বা সরু ফ্রেমে বাঁধানো ছবি।

ঝকঝকে মোজেকের সিঁড়ি।

অতীত নয়—এ যেন বর্তমান। মৃত্যু নয় যেন জীবন!

মায়াকে কোন নির্দেশ দিতে হলো না। সে নিজেই এসে মল্লিকার হাত ধরলো, এস বৌদি—

মায়া—

কেন পিসিমা!

সুহাস কোথায়?

তিনি তো বের হয়ে গিয়েছেন।

ও, শোন আমার পাশের ঘরটায় বৌমা থাকবে—

ও ঘরটা তো ছোট পিসিমা—ছোড়দার পাশের ঘরটায়—সেটাতেই তো ছোড়দা আর বৌদি এখানে এলে থাকবে ঠিক ছিল—ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথরুম রয়েছে।

ও, আচ্ছা সেই ঘরেই ওকে নিয়ে যা—

চমৎকার সাজানো-গোছান ঘরটি। ঘরের দেওয়ালে ফিকে জাফরানী রঙ।

দুটি সিংগ্‌ল্ খাট—সামান্য ব্যবধানে পাশাপাশি পাতা—মধ্যখানে ছোট একটি বেড্‌সাইড টেবিল। ঘরের মেঝেতে পুরু দামী কার্পেট বিছান।

টেবিলের উপরে একটি ছোট সুদৃশ্য টেবিল ক্লক—টিক্ টিক্ শব্দ করে চলেছে।

একধারে একটা ড্রেসিং টেবিল, তার উপরে সব নানারকম কস্‌মেটিক্‌স্ সাজান—তাছাড়াও একটা বড় স্টীলের আলমারী, পাল্লায় প্রমাণ আর্শি লাগানো। একটা কর্ণার রাইটিং টেবিল ও চেয়ার—

ঘরের জানালায় জানালায় ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে ম্যাচ করা জাফরানী রংয়ের পর্দা—তার ওদিকে একই রংয়ের টানা নেটের

হাফ পর্দা।

হঠাৎ দেওয়ালে নজর পড়লো মল্লিকার—কয়েকটা বাঁধানো ছবি—এতক্ষণে ভাল ভাবে নজর পড়েনি—হাতে আঁকা ছবি।

মল্লিকা পায়ে পায়ে এসে একটা ছবির সামনে দাঁড়াল।

একটা রঙিন প্রজাপতি—আর তার পাশে চমৎকার একটি ছোট শিশু যেন সেই ম্যাডোনার শিশুর মত।

ছবিটার মধ্যে কোথায় যেন একটা শিশু মনের পরিচয় আছে।

তার পাশের ছবিটি ছুটি মার্জার শাবকের।

সেখানেও রংয়ের সমন্বয় ভারি চমৎকার।

মল্লিকা যেন একটু আশ্চর্যই হয়—ঐ সব ছবিগুলো কার আঁকা যে এত যত্ন করে সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে।

একজন ভৃত্য ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। বয়েস খুব বেশী নয়—কুড়ি-বাইশের মধ্যে।

নতুন অচেনা মুখ।

বৌদিমণি, আপনার চা—

তুমি এ বাড়িতে কাজ কর বুঝি?

আজ্ঞে—

কি তোমার নাম?

আজ্ঞে নীলমণি—

পিছনে পিছনেই বোধ হয় ছিল মায়া—সে এসে ঘরে ঢুকল। হাতে তার একটা চাবি।

বৌদি ভাই, তোমার আলমারির চাবি।

আলমারির চাবি! কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে মল্লিকা।

হ্যাঁ তোমার আলমারির। ঐ যে—ঐ আলমারির মধ্যেই তোমার শাড়ি-টাড়ি সব আছে—

মল্লিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

তোমার চা তৈরী করে দিই।

না, থাক—তার পরই একটু থেমে ডাকে, মায়াদি—

কিছু বলছো ?

সুহাস বুঝি এই বাড়িতেই থাকে!

কে, ডাঃ চক্রবর্তী তো ? হ্যাঁ—তারপর একটু থেমে মায়া বলে, তিনিই তো ছোড়দার সর্বক্ষণের অ্যাটেনডিং ফিজিসিয়ান—তাঁর পরামর্শ মতই তো আমরা এখানে চলে এসেছি।

ভবানী দেবী এসে ঐ সময় ঘরে ঢুকলেন, এই ঘরে তোমরা একদিন থাকবে বলেই সাজিয়ে রেখেছিলাম মায়াকে দিয়ে। এ তোমারই বাড়ি বৌমা। কোন লজ্জা করো না, যখন যা প্রয়োজন হবে মায়াকে বলো—তারপর মায়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, মায়া খোকনের লেবুর রসটা দিয়েছিস ?

তৈরী করে রেখেছি—এখুনি নিয়ে যাচ্ছি।

মায়া ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

চা খেয়ে তুমি বরং একটু বিশ্রাম নাও বৌমা।

কথাটা বলে ভবানী দেবীও ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

মল্লিকা উঠে এসে খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল। নীচে বাগানে হরেক রকমের মরসুমি ফুলের রঙিন সমারোহ।

শীতের রোদ ঝিমিয়ে এসেছে—একজন উড়ে মালী গাছের পরিচর্যা করছে।

ভবানী দেবী তাকে যেন একপ্রকার জোর করেই এখানে টেনে নিয়ে এলেন। তার সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা যুক্তিতর্ক নিমেষে ধূলিসাৎ করে দিয়ে তাকে এখানে—এই বাড়িতে এনে তুললেন।

মল্লিকা যেন শেষ পর্যন্ত কোন বাধাও দিতে পারল না।

ভবানী দেবীর কাছে যেন সে আত্মসমর্পণ করল। সে যেন ভবানী দেবীর হাতে অসহায় এক ক্রীড়নক।

কিন্তু কেন—

সে বাধা দিতে পারল না কেন ? এখানে সে কেন এলো ? এখানেই সে অতঃপর অসিতের বৌ হয়েই থাকবে নাকি ?

কিন্তু জানতে পারলেন কি করে ভবানী দেবী তার কথা !

নিশ্চয়ই সুহাস—সুহাসই ফিরে এসে বলেছে তাঁকে।

মলি—

চকিতে সুহাসের ডাকে ফিরে তাকাল মল্লিকা।

সুহাস কখন যে এসে ঘরে ঢুকেছে ও জানতেও পারেনি। মিটি মিটি হাসছে সুহাস ওরই দিকে তাকিয়ে—হাতে তার একটা সুটকেস।

তোমার সুটকেসটা নিয়ে এলাম—এতদিন আমার কাছেই ছিল।

তুমি দাওনি ওটা।

দিতেই তো গিয়েছিলাম।

তবে ?

উনি নিলেন না কিছুতেই। বললেন, আশীর্বাদ বুঝি কেউ ফিরিয়ে নেয়। এখন দেখছো তো, সেদিন তুমি বা আমি কেউই ওঁকে চিনতে পারিনি।

এ তুমি কেন করলে সুহাস ?

কি—তোমার কথাটা ওঁকে বলে দিয়েছি! কেন বলেছি জান ?

কেন—

ঠিক যে কারণে এখানে তুমি তোমার আসাটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারনি সেই কারণেই। বোস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—এসেছো যখন তখন সমস্ত ব্যাপারটা একটু আলোচনা করা যাক—

আলোচনা !

হ্যাঁ—তোমার গহনাগুলো ভবানী দেবীকে ফিরিয়ে দিতে এসেছিলাম সেদিন মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ ও আক্রোশ নিয়ে সত্যিই, কিন্তু দুটো কথা বলেই বুঝতে পারলাম যাই ঘটে থাকুক না কেন ভবানী দেবীকে সত্যিই দোষীর কাঠগড়ায় এনে দাড় করানো যায় না। কোথায় যেন একটা বিভ্রান্তি প্রথম থেকেই থেকে গিয়েছে।

কি বলতে চাও তুমি—

এইটুকুই আজ বলতে চাই—অসিতের চরিত্রে ও ব্যবহারে একটা অস্বাভাবিকতা unnaturality ছিল সত্যিই এবং সেটা ভবানী দেবী জানতেন না যে তাও নয়—কিন্তু চিরদিনের সেই অস্বাভাবিকতাটুকু

যে কখনো কোন দিন অমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করতে পারে সেটাই তার চিন্তার বাইরে ছিল, নচেৎ নিশ্চয়ই সেটুকু ইচ্ছাকৃত ভাবে গোপন করে তোমার সঙ্গে তার একমাত্র ছেলের বিবাহ দিতেন না।

কি জানি কেন মল্লিকা কোন প্রতিবাদ করে না বা তর্ক তোলে না।

সুহাসের কথাগুলো নিঃশব্দে শুনে যায়।

সুহাস বলে চলে, একটা কথা ভেবে দেখো—ইচ্ছা করে অমন একটা কাজ তিনি করতেই বা যাবেন কেন? একদিকে তাঁর একমাত্র সন্তান—যে আজ তাঁর সমস্ত আশা ও সুখ-আনন্দ—অন্যদিকে সেই সন্তান বা ছেলের বধূ—যে বধূ তাঁর কত আদরের ধন—কত স্নেহের সমগ্রী কত আশা করে তিনি যাকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন—সেখানে প্রতারণা বা অন্য কিছু থাকাটা নিশ্চয়ই সম্ভব নয় বলেই আমার মনে হয়—আমার সমস্ত আক্রোশ যেন জল হয়ে গেল। অসুস্থ অসিতবাবুর ঘরে গেলাম—তাকে দেখলাম তার সমস্ত অতীত ইতিহাস একটু একটু করে সংগ্রহ করলাম। এবং বুঝলাম সব কিছুর মূলে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য অজ্ঞাত (আমাদের সকলেরই) কার্যকারণ রয়েছে—এবং যে কারণে হয়তো একটা বিচিত্র অনুভূতি—বিচিত্র একটা দ্বন্দ্ব ওর মনের কোথায়ও বদ্ধমূল হয়ে আছে যা ওকে আর সাধারণ দশজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের থেকে পৃথক করে রেখেছে। কাজেই মনে হয় না সেইটা যদি আমরা খুঁজে বের করতে পারি অসিতবাবু আবার সত্যিকারের একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠবেন!

কিন্তু—

জানি তুমি কি বলবে মলি, সুহাস মল্লিকাকে বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু বিশ্বাস কর তুমিও ঠিক উন্মাদ নয়—এবং কোন দিন যে স্বাভাবিক সুস্থ হয়ে উঠবে না তাও নয়। ধীরে ধীরে ও অনেকটা আগের মতই হয়ে উঠেছে এবং ক্রমশঃ আরো উঠবে—এখনো হয়ত সকলকে ভাল করে চিনতে পারছে না বা পারলেও চিনতে চাইছে না। কিন্তু ওর অবচেতন মনের মূল দ্বন্দ্বটা কি এবং কোথায় যদি খুঁজে বের করতে পারি—যা আমাদের পারতেই হবে এবং পারবও, তাহ'লে ও সম্পূর্ণ সুস্থ নতুন

মানুষ হয়ে উঠবে।

সত্যি তাই তোমার ধারণা?

হ্যাঁ—ধারণা নয় বিশ্বাস। এবং কেবল আমারই নয় বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ দেরও তাই বিশ্বাস। আর সেই ভাবেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি—কিন্তু এ তো আমার একার কাজ নয়, কেবলমাত্র একজন ডাক্তারের পক্ষেও সম্ভব নয়—মলি এ কাজে তুমি আমায় সাহায্য কর। তোমার সেবা সহানুভূতি মমতা ও ভালবাসা দিয়ে একটু একটু করে অসিতকে তুমি তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য কর—তার ঐ মোহের জাল থেকে তাকে ছিন্ন করে ওকে সুস্থ—স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনো—জানো মলি সে রাতের পরেও আর তো তুমি তাকে দেখো নি—এই বাড়িতেই সে এই ঘরের ঠিক পাশের ঘরেই আছে। ওকে আজ দেখলেই—ওর মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে একটা অসহায় শিশু সে—দেহের দিক দিয়েই সে বড় হয়েছে কিন্তু মনের কোথায় যেন সে আজো ছোট্ট একটি অসহায় শিশু!

কিন্তু আমি কি পারব সুহাস?

পারবে। যদি কেউ সত্যি পারে তো তুমিই পারবে।

॥ ২০ ॥

সুহাসের সঙ্গে ভয়ে ভয়েই গিয়ে ঢুকেছিল মল্লিকা ঐ দিন সন্ধ্যারাত্রে অসিতের ঘরে। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই যেন থমকে দাঁড়ায় মল্লিকা।

এ কোথায় এলো মল্লিকা!

চারিদিকে খেলনা ছবি—এলোমেলো একটা বিশৃঙ্খলতা আর তার মধ্যে শয্যার উপরে বসে একটা পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরনে একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল—পাঞ্জাবির বুকের বোতামগুলো খোলা অসিত একটা খাতায় রঙ ও তুলির সাহায্যে আপন মনে কি যেন এঁকে চলেছে।

অসিতবাবু—

মৃদু কণ্ঠে ডাকে সুহাস।

মুখ তুলে তাকাল অসিত সুহাসের দিকে—তার পরই মল্লিকার দিকে নজর পড়তে তার দিকেই তাকিয়ে থাকে।

অতি সাধারণ ভাবে একটা কালো পাড় সাদা শান্তিপুরী শাড়ি পরে এসেছিল মল্লিকা সুহাসেরই পূর্ব নির্দেশে। মাথায় কোন ঘোমটা পর্যন্ত নেই—হাতে একগাছি করে সোনার বালা আর দেহে কোথায়ও অলঙ্কারের চিহ্নমাত্রও নেই।

কিন্তু অসিতের দৃষ্টি থেকে অসিত যে মল্লিকাকে চিনতে পেরেছে সে রকম কিছুই মনে হয় না। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ মল্লিকার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার নিজের ছবি আঁকার কাজে মন দিল।

সুহাস ও মল্লিকা যে তার সামনে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে যেন জানেই না—জানবার কোন আগ্রহও নেই।

ফলের রসটা খাওয়াতে পারেনি মায়া সুহাসকে। গ্লাস ভর্তি ফলের রসটা পাশেই একটা টেবিলের ওপরে ঢাকা দেওয়া ছিল।

সুহাস মল্লিকার দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করে তাকে অসিতকে ফলের রসটা খাওয়াবার জন্য।

মল্লিকা একটু যেন ইতস্ততঃ করে।

চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে সুহাস বলে, যাও—চেষ্টা কর খাওয়াতে—

মল্লিকা এবারে এগিয়ে গিয়ে ফলের রসের গ্লাসটা হাতে তুলে নেয়—পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় গ্লাসটা হাতে অসিতের সামনে।

এটা খেয়ে নিন—

অসিত চোখ তুলে তাকাল মল্লিকার দিকে।

খেয়ে নিন রসটা—

অসিত মাথা নাড়ে।

খান—

আরো একটু এগিয়ে যায় মল্লিকা।

অসিত চেয়ে আছে মল্লিকার মুখের দিকে।

খেয়ে নিন—

অসিত এবারে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নেয়, এক চুমুক খেয়েই নামিয়ে রাখছিল গ্লাসটা, কিন্তু মল্লিকা বলে, না সবটা খেয়ে নিন—

অসিত এবার সবটুকু রসই ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলে।

মল্লিকা শূন্য গ্লাসটা অসিতের হাত থেকে নেয়।

সুহাসের দুচোখে যেন আনন্দ উছলে উঠছে।

পাশেই একটা টাওয়েল ছিল। সেটা এবার মল্লিকা অসিতের হাতে দিয়ে বলে, মুখটা মুছে নিন।

অসিত মল্লিকার নির্দেশ পালন করে।

তুমি এঘরেই থাক এখন মল্লিকা—

কথাটা বলে সুহাস ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

অসিত তখন আবার ছবি আঁকায় মন দিয়েছে।

ঘরটা অগোছাল হয়ে ছিল মল্লিকা ঘরটা গোছাতে শুরু করে। অসিত কিন্তু ফিরেও তাকায় না—ভবানী দেবীও আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলেন, অসিতের শান্ত ভাব তাঁকে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত করে।

একদিন দুদিন করে ক্রমশঃ দশ-বারটা দিন কেটে যায়। মল্লিকার যেন কেমন একটা নেশা ধরে যায়—সে যেন তার সমস্ত মন অসিতের সেবায় ঢেলে দেয়।

আসলে একটার পর একটা বিপর্যয় তার জীবনে তাকে যেন সত্যিই কেমন দিশেহারা করে দিয়েছিল, যেদিকে চায় একটা বিরাট শূন্যতা যেন তাকে গ্রাস করতে চাইছিল।

দাঁড়াবার মত যেন এতটুকু একটু মাটি নেই তার কোথাও পায়ের তলায়। কি করবে কোথায় যাবে, সব কিছুই যেন তার এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল।

যা কিছু সে করছিল, কিছু করবার নেই বলেই যেন করছিল।

বেদনা—হতাশা—লজ্জা—ব্যর্থতা সব কিছু মিলে তার মনের মধ্যে

এমন একটা অনুভূতিহীন নিষ্ক্রিয়তা এনেছিল যে মল্লিকা যেন ভিতরে ভিতরে সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছিল—আর ঠিক সেই সময় ভবানী দেবী গিয়ে তার সামনে পড়ে তার সকল যুক্তি তর্ক বাধা নিমেষে ধূলিসাৎ করে দিয়ে তাকে যেন এক প্রকার জোর করে টেনে এনেই অসিতের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথমটায় মল্লিকা যতই বাধা দিক এবং যতই সে অনিচ্ছায় ভবানী দেবীর সঙ্গে এসে থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত কিন্তু অসিতের সেবার ভারটা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল।

সে যেন বিচিত্র এক মুক্তির স্বাদ।

বেদনা—হতাশা—লজ্জা ও ব্যর্থতার পীড়ন থেকে মুক্তি।

মল্লিকা অসিতকে সেবা করতে লাগল।

দিন ও রাত্রির সর্বক্ষণ প্রায় তারই ঘরে মল্লিকার কেটে যায়—এক অসুস্থ অবোধ শিশুমনের সঙ্গে সে তার সমস্ত মনটা যেন মিশিয়ে দিয়েছে।

সে যেন ভুলে গিয়েছে সে সুস্থ, স্বাভাবিক—কিন্তু অসিত সুস্থ, স্বাভাবিক নয়। অসিতকে নাওয়ানো খাওয়ানো ত আছেই—সর্বক্ষণ তাকে সঙ্গ দিচ্ছে—বসে বসে কথা বলে।

আগে সর্বক্ষণ অসিত চুপচাপই থাকত কিন্তু এখন দেখা যায় মল্লিকার সঙ্গে কথা বলছে।

হাসাহাসি করছে।

মল্লিকা যেন ভুলে গিয়েছে সে আর অসিত ছাড়া বাড়িতে আর কেউ আছে।

কোন বেশভূষা নেই—বেশীর ভাগ সময় সাধারণ একটা শাড়ি পরনে—মাথার চুলে তো চিরুনি পড়েই না।

মল্লিকাকে দেখে মনে হয় সে যেন যোগিনী।

সেদিন বিকালের দিকে অসিতকে ফলের রস খাইয়ে ঘর থেকে বের হয়েছে মল্লিকা বারান্দায়—ভবানীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

মল্লিকা—

ভবানী দেবীর ডাকে মল্লিকা শাশুড়ীর দিকে চোখ তুলে তাকায়।

মল্লিকাই একদিন ভবানী দেবীকে বলেছিল, মা, আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন—ঐ নামে ডাকবেন না—

বিস্মিত ভবানী দেবী পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন দুচোখে প্রশ্ন নিয়ে—কিন্তু কোন প্রশ্ন তোলেন নি।

বোধহয় মনে পড়ে গিয়েছিল কি কথা বলে তিনি মল্লিকাকে নিজ গৃহে নিয়ে এসেছিলেন।

বলেছিলেন অতঃপর, তাই হবে।

তার পর থেকে ভবানী দেবী ওকে মল্লিকা বলেই ডাকেন।

মল্লিকা শুধায়, কিছু বলছেন ?

হ্যাঁ—একটু ভাল জামা-কাপড় পরতে পার না—চুলটা কত দিন বাঁধ না বল তো ? যাও নিজের ঘরে যাও—কাপড়টা বদলে চুলটা বেঁধে এসো—আমি না হয় ততক্ষণ খোকনের ঘরে আছি—

নিজের পরিধেয় শাড়িটার দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে মৃদু হেসে বলে মল্লিকা, কেন এ শাড়িটা তো বেশ পরিষ্কারই আছে।

না—যাও বদলে এসো—মাথাটাতেও একটু চিরুনি দিয়ে এসো।

না, এই ভাল—তাছাড়া—

কি ?

উনি বোধ হয় সাজগোজ ঠিক পছন্দ করেন না। আমি ওঁর সেবা করতেই এখানে এসেছি—যাতে উনি সুস্থ হয়ে ওঠেন তাই দেখতে হবে আমাকে—

আসলে মল্লিকা ঘরের মধ্যে যে আলমারি-ভর্তি জামা শাড়ি ছিল তার একটাও আজ পর্যন্ত স্পর্শ করে নি।

টেবিলের ওপরে সাজান একটা কসমেটিকস্‌ও ছোঁয় নি।

এখানে আসার পরদিনই সুহাসকে দিয়ে তার বাড়ি থেকে ফেলে আসা সুটকেসটা আনিয়ে নিয়েছিল। তার মধ্যে যা জামা-কাপড় ছিল তাই মল্লিকা ব্যবহার করছিল।

ভবানী দেবী মল্লিকার কথার প্রত্যুত্তরে আর কিছু বললেন না।

নিঃশব্দে সরে গেলেন।

মল্লিকা এসে পুনরায় অসিতের ঘরে ঢুকতেই অসিত জিজ্ঞাসা করে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে মল্লিকা ?

আজকাল দেখা যায় যতক্ষণ অসিত জেগে থাকে, মল্লিকা তার ঘর থেকে বাইরে গেলে সে যেন অস্থির হয়ে ওঠে।

মল্লিকা অসিতের কথার জবাব না দিয়ে বলে, বাগানে বেড়াতে যাবেন ?

বাগান ?

হ্যাঁ!

কোথায় বাগান ?

কেন বাড়ির পিছনেই তো আছে—

তুমি যাবে তো ?

যাবো, চলুন—

দীর্ঘদিন পরে ঘরের বাইরের খোলা জায়গায় মুক্ত আলো হাওয়ায় এসে অসিত যেন বেশ খুশি হয়ে ওঠে।

মল্লিকা শুধায়, সুন্দর জায়গাটা, না ?

হ্যাঁ, সুন্দর।

ঐ বড় লাল ফুলটার ছবি আঁকতে পারেন ? মল্লিকা একটা বিরাট ডালিয়া ফুল দেখায় অসিতকে।

হ্যাঁ—পারি। তার পরই একটু থেমে বলে, তোমার একটা ছবি আমি আঁকবো ?

আমার !

মল্লিকা যেন কেমন একটু থতমত খেয়েই অসিতের দিকে তাকায়।

চল না ঘরে, উৎসাহিত-ভরে অসিত বলে ওঠে, এখুনি এঁকে দেবো।

ছবি আঁকতে আপনার খুব ভাল লাগে, তাই না ?

তোমার লাগে না ?

আমি তো আঁকতে জানি না।

অসিত কেমন যেন একটু অবাকই হয়েছে কথাটা শুনে। বলে, আঁকতে পার না?

না।

বাগানে অজস্র রং-বেরংয়ের ফুল। লাল হলুদ কমলালেবু রং, ডিপ মেরুন, ভায়োলেট কত যে রং।

দুজনে বাগানের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অসিত মধ্যে মধ্যে মল্লিকার মুখের দিকে তাকায়।

এক সময় মল্লিকা প্রশ্ন করে, কি দেখছেন অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে?

তোমাকে যেন আগে কোথায় দেখেছি!

দেখেছেনই তো। বলুন তো কোথায় দেখেছেন?

কি জানি ঠিক মনে পড়ছে না। আচ্ছা মল্লিকা—

বলুন?

তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

কোথায় আবার থাকব, এখানেই তো ছিলাম।

এখানেই ছিলে?

হ্যাঁ।

ঘরে ফিরে এসে অসিত বলে, তুমি ওখানে দাঁড়াও জানালার কাছে। আমি তোমার ছবি আঁকবো।

মল্লিকা একটু ইতঃস্তত করে কিন্তু অসিত তখন নিয়ে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, তারপর নিজে পেনসিল হাতে ইজেলের সামনে গিয়া দাঁড়ায়।

হাত দিয়ে মল্লিকার মাথার কাপড়টা সরিয়ে দেয় অসিত। বলে, কাপড়টা এই ভাবে থাক। চুলটা বুকের পাশ দিয়ে—

অসিত আঁকতে শুরু করে।

দুদিন অসিত ছবি আঁকা নিয়েই যেন মত্ত থাকে।

রাত্রে অসিতকে খাইয়ে তাকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে সে যতক্ষণ না ঘুমাত, তার শয্যার পাশেই বসে থাকত মল্লিকা। তারপর সে ঘুমোলে তার গায়ের কম্বলটা ভাল করে টেনে দিয়ে এক সময় পা টিপে টিপে ঘর থেকে বের হয়ে যেত।

সে রাত্রেও অসিত ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে মল্লিকা অসিতের শয্যার পাশ থেকে উঠতে যাবে, হঠাৎ অসিত হাত বাড়িয়ে মল্লিকার একটা হাত চেপে ধরে।

একি—আপনি ঘুমোন নি?

না।

মল্লিকা আবার অসিতের শয্যার পাশটিতে বসে পড়ে বলে, কেন, ঘুম আসছে না বুঝি?

না। আমি জানি আমি ঘুমোলেই তুমি চলে যাবে তাই ঘুমোই নি।

আমি চলে যাবো কে বললে?

জানি—কাল ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল হঠাৎ—দেখি আমি একা ঘরে তুমি নেই—কেন তুমি চলে যাও?

মল্লিকা অসিতের কথার কি জবাব দেবে হঠাৎ যেন বুঝে উঠতে পারে না।

কেন তুমি চলে যাও! যাবে না বল তাহলে আমি ঘুমোবো—

যাবো না আমি, আপনি ঘুমোন—

ঠিক বলছো?

হ্যাঁ—আমি আপনার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিই আপনি ঘুমোন।

মল্লিকা অসিতের মাথার রেশমের মত পাতলা চুলগুলো বিলি করে দিতে থাকে ডান হাত দিয়ে কিন্তু অসিত মল্লিকার বাঁ হাতটা ধরে থাকে।

এক সময় অসিত ঘুমিয়ে পড়ে।

কত রাত তখন কে জানে!

ভবানী দেবীর চোখে সে রাত্রে ঘুম ছিল না।

হঠাৎ তাঁর কানে এলো বেহালার সুর।

নিশ্চয়ই সুহাস ঘুমোয় নি—জেগে আছে। ভবানী দেবী তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে সুহাসের ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

সমস্ত বাড়িটা স্তব্ধ নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

সেই স্তব্ধতার মধ্যে বেহালার সুরটা যেন একটা চাপা কান্নার মত মনে হয়।

সুহাসের ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ অসিতের ঘরের সামনে এসে অজান্তেই দাঁড়িয়ে গেলেন ভবানী দেবী।

অসিতের ঘরের দরজাটা খোলা।

ঘরের মধ্যে মৃদু একটা নীলাভ রাত-আলো জ্বলছে।

সেই আলোয় চোখে পড়ল—অসিত তার শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে আর তার শিয়রের ধারে যেন পাষাণ-মূর্তির মত বসে আছে তন্দ্রাহীন মল্লিকা।

তার দুটি চোখের স্থির অপলক দৃষ্টি ঘুমন্ত অসিতের মুখের ওপরে নিবদ্ধ।

মল্লিকার পর্যাপ্ত রুক্ষ কেশ তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে বুকের উপর নেমে এসেছে—টেবিল ল্যাম্পের খানিকটা আলো তার মুখের একাংশে এসে পড়েছে।

একবার যেন ইতস্তত: করলেন ভবানী দেবী।

তারপর ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে এসে ঘরে ঢুকলেন। মল্লিকা জানতেও পারে না—তার পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে আলতো ভাবে একটা হাত মল্লিকার পিঠে স্পর্শ করতেই সে চমকে ফিরে তাকায়।

কে!

আমি—। ঘুমোতে যাও নি মা তুমি?

হ্যাঁ—যাবো।

যাও এবারে ও তো ঘুমিয়ে পড়েছে—

মল্লিকার মুখটা যেন সহসা কি এক লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

কিন্তু উঠতে পারে না—অসিত তখনো তার বাঁ হাতটা ধরে আছে। যদি উঠতে গেলে অসিতের ঘুমটা ভেঙ্গে যায়?

যাও মা এবার গিয়ে শুয়ে পড়, অনেক রাত হয়েছে।

আপনি যান—আমি যাচ্ছি—

কি জানি কেন ভবানী দেবী আর কোন কথা বললেন না। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ডাঃ দে অসিতের ক্রমশঃ উন্নতি দেখে ভারী খুশি।

তিনি সুহাসকে বলেন, আশ্চর্য মেয়েটির সেবা—ও যেভাবে সুস্থ হয়ে উঠছে মনে হয় খুব শীঘ্রই আবার পূর্বের মানসিক সুস্থতায় ফিরে আসবে—সব ওর মনে পড়ে যাবে—সবাইকে ও চিনতে পারবে।

ডাঃ দে মিথ্যা বলেন নি।

সত্যিই অসিতের মনের উপর থেকে স্মৃতির কুয়াশাটা একটু একটু করে অপসারিত হচ্ছিল।

তার ব্যবহার আরো স্বাভাবিক হয়ে ওঠে পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যেই।

রোজ ভোরে পূজা সেরে ভবানী দেবী ছেলের ঘরে একবার আসতেন—ছেলের মাথায় নির্মাল্য ফুল ছুঁইয়ে তাকে আশীর্বাদ করে যেতেন।

আগে আগে এতদিন অসুস্থ হবার পর থেকে অসিত ঐ সময়টা কখনো কখনো মার দিকে তাকালেও মনে হতো যেন তার চোখে মুখে কোন বৈলক্ষণ্যই নেই।

কিন্তু আজ ভবানী দেবী এসে অসিতের মাথায় হাত দিতেই অসিত মুখ তুলে তাকিয়ে হাসে।

খোকন—

মা !

অসুস্থ হবার পরে ঐ প্রথম অসিত ভবানী দেবীর ডাকে মা বলে সাড়া দিল।

দুহাতে অসিত মাকে জড়িয়ে ধরে—ভবানী দেবীও অসিতকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অজস্র অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে তার চিবুক ও গণ্ড প্লাবিত করতে থাকে।

মল্লিকা অসিতের চা ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে ঘরে পা দিয়ে ঐ দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে যায়।

কিন্তু মা ও ছেলের সেদিকে দৃষ্টিই পড়ে না।

সুহাসও ঐ সময় ঘরে এসে ঢোকে, প্রত্যহ সকালের দিকে একবার যেমন সে আসে অসিতের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে তেমনি।

তারও দৃশ্যটা চোখে পড়ে।

মা!

কেন বাবা ?

কবে আমরা এ বাড়িতে এলাম বল তো ?

এই ত কিছুদিন—ভবানী দেবী জবাব দেন।

আশ্চর্য! কিছু আমার মনে পড়ছে না। অসিত মৃদু কণ্ঠে বলে।

হঠাৎ ঐ সময় অসিতের সুহাসের প্রতি নজর পড়ে।

উনি কে মা ?

ভবানী দেবী ফিরে তাকিয়ে সুহাসকে দেখতে পান।

ভবানী দেবী বুঝতে পারেন সুহাসকে চিনতে পারছে না অসিত—তিনি বলেন, ও ত সুহাস—

সুহাস ?

হ্যাঁ, ডাঃ সুহাস চক্রবর্তী।

উনি এখানে কেন মা ? তবে কি আমি অনেক দিন অসুস্থ ছিলাম, কি হয়েছিল আমার ?

ভবানী দেবী কি বলবেন অতঃপর ভেবে পান না।

সুহাসই তখন এগিয়ে আসে। বলে, হ্যাঁ অসিতবাবু, আপনি হঠাৎ

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন—তখন এখানে আপনাকে নিয়ে আসা হয়, আমি আপনার চিকিৎসা করেছি—

কিন্তু আশ্চর্য—আমি এত অসুস্থ হয়েছিলাম, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, কিছুই তো আমার মনে নেই—

মনে পড়বে—একটু একটু করে সবই আপনার মনে পড়বে—

অসিত যেন কেমন কথাটা শুনে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যায়।

সুহাস মৃদু কণ্ঠে বলে, সেজন্য অত চিন্তার কি আছে! মানুষ কি অসুস্থ হয় না—অজ্ঞান কি হয় না—কত সময় মানুষ এক মাস দেড় মাস পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে থাকে কিছু মনে থাকে না। নিন—চা খান—মল্লিকা ওকে চা দাও।

ট্রে-টা হাতে এতক্ষণ মল্লিকা যেন পাথরের মতই দাঁড়িয়ে ছিল।

সুহাসের ডাকে সে যেন সম্বিৎ ফিরে পায়।

ট্রে-টা হাতে নিঃশব্দে এগিয়ে আসে।

অসিত মল্লিকার দিকে তাকায়।

চোখের ইশারায় সুহাস ভবানী দেবীকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলে। ভবানী দেবী বের হয়ে যান—সুহাসও বের হয়ে যায়।

অসিত খেয়াল করে না ওদের ঘর থেকে বের হয়ে যাবার ব্যাপারটা।

অসিত তখনো মল্লিকার দিকে চেয়ে আছে।

মল্লিকা সে চাউনি যেন সহ্য করতে পারে না। সে তাড়াতাড়ি কাপে চা ঢেলে চা তৈরী করায় মন দেয়।

তুমি? অসিত শুধায়।

আমি মল্লিকা—

মল্লিকা! তোমাকে কোথায় আমি দেখেছি যেন—একটু যেন চিন্তা করে অসিত, তারপর বলে, হ্যাঁ মনে পড়েছে—আমাদের মুর্শিদাবাদের বাড়ির উঠানে—পুরোহিত মশাই মন্ত্র পড়ালেন—তোমার হাত আমার হাতে—হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে পড়েছে—সেই কাজললতা দিয়ে তোমার মাথায় সিন্দুর পরিয়ে দিলাম—তুমি—তুমি তো আমার স্ত্রী—

মল্লিকা কোন জবাব দেয় না।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মল্লিকা চায়ের কাপে চা তৈরী করে এগিয়ে ধরে অসিতের দিকে, চা—

অসিত কিন্তু কোন আগ্রহই দেখায় না চা-পানের।

মল্লিকা আবার তাগিদ দেয়, কই—খান—চাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চায়ের কাপটা এবারে তুলে নেয় অসিত।

অসিতের সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে এসেছে—কখন কি করে এলো এখনো জানে না মল্লিকা, কিন্তু সে যেন হঠাৎ কেমন সংকোচ বোধ করে স্বাভাবিক অসিতের সামনে অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকতে।

গত এক মাসেরও উপর অসিতের সঙ্গে ব্যবহারের যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যটুকু ছিল—সেটা যেন এই মুহূর্তে আর নেই—যেন কোথায় ছন্দপতন ঘটেছে একটা।

উচ্ছল তটিনী হঠাৎ যেন বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

কি জানি কেন ঐ মুহূর্তে অসংকোচে অসিতের দিকে তাকাতেও যেন পারছে না মল্লিকা।

হঠাৎ ঐ সময় অসিত ডাকে, মল্লিকা—

কিছু বলছেন?

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম আমি?

হ্যাঁ।

কতদিন অজ্ঞান ছিলাম?

দু মাস তো প্রায় হবেই।

দু'মাস—দু'মাস—কথাটা মৃদু কণ্ঠে আত্মগতভাবে উচ্চারণ করে অসিত বার দুই।

আবার যেন ও অন্যমনস্ক।

আবার যেন ও কি ভাবছে।

মল্লিকা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মল্লিকা। সুহাস তার

ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে নিঃশব্দে ধূমপান করছিল।

এসো মলি, অসিতবাবু কি করছেন?

মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করছেন।

স্বাভাবিক—কিন্তু ঐ চিন্তাটা যাতে কিছুতেই ওর মনের মধ্যে না ঢুকতে পারে, ওর মনকে ভারী করে তুলতে না পারে তাই তোমায় এখন করতে হবে। সদ্য সদ্য যে মনের কুয়াশা ওর কেটে গিয়েছে বলে আমরা মনে করছি—সেটা সত্যি সত্যি ঠিক একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে কিন্তু কেটে যায় নি। কারণ ঐ কুয়াশার মূলে একটা কিছু সত্য আছে—অবচেতন মনের যে সত্যটাই সেদিন অকস্মাৎ ওকে অস্থির—চঞ্চল—অস্বাভাবিক করে তুলেছিল প্রচণ্ড ভাবে।

কিন্তু সে যাই হোক এখন তো উনি স্বাভাবিক—তাই বলছিলাম আমার এখানকার কাজ তো শেষ হয়েছে—

কাজ শেষ হয়েছে কি বলছো তুমি মলি! কাজ তো শুরু করেছি আমরা মাত্র—যত দিন না ওর মনের ঐ কুয়াশার মূলটাকে খুঁজে বের করতে পারছি, ততদিন ও চিরদিনের মত সত্যিকারের সুস্থ স্বাভাবিক একজন হয়ে উঠবে না, উঠতে পারে না। আর আমাদের কাজও শেষ হবে না। তারপর একটু থেমে সুহাস বলে, আমি আর কতটুকু পারব—যা করবার তুমিই করবে—তুমি পারবে হয়ত ওর মনের গহনে ডুবুরীর মত নেমে ঐ মূলটাকে খুঁজে বের করতে—

আবার তাহলে উনি অমনি অসুস্থ হয়ে উঠতে পারেন?

পারেন বৈকি। কারণ এই তো ওর প্রথম না—

কি বলছো তুমি সুহাস!

হ্যাঁ—এই দ্বিতীয় বার—

আগেও তাহলে উনি ঐ রকম হয়েছেন!

হয়েছেন—সেটা অবিশ্যি ছোটবেলা—ওঁর কৈশোরে—তবে এবারকার ব্যাপারটা একটু সিরিয়াস হয়েছিল।

তুমি জানলে কি করে সে কথা?

ওঁর মার মুখ থেকেই। সব তোমাকে আমি বলবো—সব তুমি

জানতে পারবে। মানুষের মন বস্তুটা যে কি বিচিত্র, কত সূক্ষ্ম অনুভূতির কম্পন যে সেখানে জাগে এবং সেই সব কম্পন অকস্মাৎ যে কি তীব্রভাবে বাইরে প্রকাশ পায় তার আমরা কতটুকুই বা জানি। কিন্তু যাক সে কথা—তুমি আর এঘরে বেশীক্ষণ থেকো না। যাও, ওর কাছে যাও। এ সময় ওর একলা থাকা উচিত নয়। ওকে—

সুহাসের কথা শেষ হলো না।

ঐ সময় সুহাসের ঘরের মধ্যে অসিতের গলা শোনা গেল।

মল্লিকা—

অসিত যে কখন ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে দুজনার একজনও ওরা জানতে পারে নি।

অসিতের কণ্ঠস্বরে দুজনাই যুগপৎ ফিরে তাকায়।

মল্লিকা, তোমাকে আমি ডাকছিলাম যে! শুনতে পাওনি তুমি!

সুহাস মল্লিকাকে নিঃশব্দে চোখের ইসারা করে।

মল্লিকা অসিতের দিকে তাকিয়ে বলে, চলুন—

মল্লিকা অসিতকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

ওরা বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ভবানী দেবী ঘরের মধ্যে এসে ঢোকেন।

বৌমা কি বলছিল তোমাকে সুহাস?

অসিতবাবুর কথাই হচ্ছিল মা ওর সঙ্গে। ওকে বলছিলাম অসিতবাবুর এই সুস্থ হয়ে ওঠাটা ঠিক সেই সুস্থ স্বাভাবিকতা নয় যা আমরা চাইছি। যেমন করেই হোক ওঁকে সমাজের একজন স্বাভাবিক মানুষের মত সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতে হবে।

সে কি ও হবে?

হবে বৈকি মা। হতেই হবে যে।

ভবানী দেবী মৃদু কণ্ঠে বলেন, দেখো!

ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে ডাঃ দের সঙ্গে সুহাসের কথা হচ্ছিল।

ডাঃ দে বলছিলেন, ওর মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্বর কথাটা তোমার

বলছিলাম সুহাস সেই দ্বন্দ্বটাই কোথায় কেন—কি করে তার পত্তন হলো সেটা এবারে আমাদের ধীরে ধীরে জানতে হবে। ওর প্রতিটি কাজ—কথাবার্তাকে study করলেই আমরা ক্রমশঃ সেটা জানতে পারব। সর্বক্ষণ তোমার চোখ আর কানকে মেলে রাখতে হবে—ওখান থেকে তোমায় তাই বলছিলাম এখন চলে আসা চলবে না। ওর কাছে কাছেই তোমাকে থাকতে হবে।

তাই হবে স্যার—

হ্যাঁ—যেমন যেমন বুঝবে আমাকে তুমি রিপোর্ট করবে। আরো ক'টা দিন যাক—ওকে আর একটু study করি আমরা, তারপর ওকে নিয়ে sitting দেবো—

সেদিনকার মত সুহাস বিদায় নিল।

॥ ২২ ॥

অসিত সুস্থ হয়েছে বটে কিন্তু মল্লিকা লক্ষ্য করে ও যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

বেশীর ভাগ সময়ই আপন মনে যেন একা একা বসে আজকাল কি ভাবে।

তবে একটা ব্যাপার মল্লিকা লক্ষ্য করে, অসিত যেন চায় ও সর্বক্ষণ তার কাছে কাছে থাকুক। একদিন বিকেলে বাগানের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ এক সময় অসিত বলে, আচ্ছা মল্লিকা, অজ্ঞান হয়ে যখন ছিলাম তখনকার কোন কথাই আমার মনে পড়ে না কেন বল তো?

মনে পড়ে না বুঝি!

না।

কেন?

কি করে মনে থাকবে। মন তো তখন সহজ অবস্থায় থাকে না।

তাই—সেই জন্যই বোধহয় আগের বারের কথাটাও আমার মনে নেই—

আগের বারের কথা ?

হ্যাঁ—শুনেছি আর একবারও নাকি আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তাই তো আমার বড় ভয় করে—

কিসের ভয় ?

আবার যদি অজ্ঞান হয়ে যাই—

না, না—আবার অজ্ঞান হবেন কেন ?

হতে পারি—আবারও হয়ত হতে পারি।

ওসব কথা ভাববেন না—আচ্ছা একটা কথা বলবো ?

কি ?

আপনি আপনার বাবাকে ছোটবেলা খুব ভালবাসতেন, তাই না ?

কেন—ও কথা জিজ্ঞাসা করছো কেন মল্লিকা ? অসিতের গলায় যেন কেমন একটা দ্বিধার সংশয়ের সুর।

বাইরের দালানে সিঁড়ির ঠিক মাথায় আপনার বাবার যে বড় অয়েল পেনটিংটা টাঙ্গানো আছে, আজকাল প্রায় দেখি—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে ঐ ফটোটার দিকে আপনি কেমন গভীর ভাবে তাকিয়ে দেখেন—

হ্যাঁ, বাবা—বাবাকে আমি ছোটবেলায় খুব ভালবাসতাম—বাবাও আমাকে ভালবাসত—বলতে বলতে হঠাৎ অসিত থেমে গেল।

মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরল।

কি হলো—মাথাটা চেপে ধরলেন কেন ?

শঙ্কিত মল্লিকা প্রশ্ন করে।

সেই যন্ত্রণাটা—

যন্ত্রণা !

হ্যাঁ—সেই যন্ত্রণাটা মাথার মধ্যে যেন মনে হলো শুরু হলো।

তাড়াতাড়ি মল্লিকা অসিতের হাত ধরে বাগানের মধ্যে একটা বেঞ্চে বসিয়ে দেয়, বসুন—এখানে বসুন—

আমি একটু শোবো।

বেশ তো—শোন না, আমার কোলে মাথা দিয়ে শোন—মাথাটা আপনার আমি টিপে দিই।

অসিত মল্লিকার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

মল্লিকা অসিতের মাথাটা আস্তে আস্তে টিপে দেয়।

অসিত নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে।

ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে নেমে আসে।

আকাশে একটা দুটো করে তারা দেখা দেয়।

চৈত্র মাস শেষ হতে চলল—বেশ গরম পড়তে শুরু করেছে শহরে।

মল্লিকা এক সময় শুধায়, এখন কেমন বোধ করছেন?

অসিত সে কথার জবাব না দিয়ে উঠে বসে বেঞ্চের উপর।

চলুন বাড়ির ভিতরে যাই—

অসিত কোন জবাব দেয় না—মল্লিকা অসিতকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ফিরে আসে।

সিঁড়ির আলো জ্বলছিল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে অসিত তার বাবার ফটোটার দিকে চেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়—কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে থাকে ফটোটার দিকে, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

সেই রাত্রেই ব্যাপারটা ঘটলো।

ডাঃ দে অসিতকে একটা নতুন ঘুমের ঔষধ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন রাত্রের আহারের আধঘণ্টা পরে কোন পানীয়ের সঙ্গে সেই ঔষধটা খাইয়ে দিতে।

অসিত শয্যার উপর বসে ছিল।

মল্লিকা এক কাপ ওভালটিন নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

কি ওটা, অসিত শুধায়।

মল্লিকা বলে, ওভালটিন—এটা খেয়ে শুয়ে পড়ুন—

মল্লিকা কথাটা বলে ঔষধের শিশিটা নিয়ে আসে শয্যার পাশে।

টেবিলের ওপরে চায়ের কাপটা রেখে—ঔষধটা ছিপি খুলে ওভালটিনের কাপের মধ্যে খানিকটা ঢেলে দেয়।

অসিত যে একদৃষ্টে ব্যাপারটা চেয়ে চেয়ে দেখছে মল্লিকা জানতেও পারে না।

মল্লিকা অতঃপর কাপটা নিয়ে অসিতের সামনে আসতেই আচমকা অসিত হাতের এক ধাক্কা দিয়ে মল্লিকার হাতের কাপটা ফেলে দিয়ে অস্ফুট গলায় চিৎকার করে ওঠে, বিষ—বিষ—না, না—বিষ—

মল্লিকা ঘটনার আকস্মিকতায় কেমন যেন থতমত খেয়ে অসিতের দিকে তাকায়—অসিতের দুচোখে কেমন যেন এক দৃষ্টি।

সে দৃষ্টিতে যেন ভয়—সন্দেহ—ঘৃণা!

কাপ ভাঙ্গার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ইতিমধ্যে ভবানী দেবী ঐ ঘরে এসে ঢোকেন, কি, কি ভাঙ্গল—

বিষ—বিষ—

অসিত তখনো বলছে।

বিষ? কোথায় বিষ?

সুহাসও কাপ ভাঙ্গার শব্দটা শুনেছিল—সেও ঐ ঘরে ছুটে আসে। এবং ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অসিতের শেষের কথাগুলো তার কানে যায়।

সে দ্রুতপায়ে সামনে এগিয়ে আসে, বিষ—কোথায় বিষ?

ঐ যে মল্লিকা শিশি থেকে ঢালল!

শিশি থেকে—কোন্‌ শিশি!

মল্লিকা ঘুমের ঔষধের শিশিটা সুহাসকে দেখায়।

সুহাস তখন বলে, কে বললে এটা বিষ—এটা তো একটা ঘুমের ওষুধ।

ঘুমের ওষুধ—

হ্যাঁ—ঘুমের ওষুধ—যাতে রাত্রে ভাল ঘুম হয় তাই এটা খেতে দেওয়া হয়েছে আপনাকে। আর একথা আপনার মনেই বা হলো কেন অসিতবাবু যে মল্লিকা আপনাকে বিষ দেবে। সে আপনার

স্ত্রী না—কোন স্ত্রী বুঝি তার স্বামীকে বিষ দেয়—ঠিক আছে আপনি খাবেন না ঐ ওষুধ—আপনাকে আমি ঘুমের অন্য ঔষধ দিচ্ছি—মল্লিকা ঐ শিশিটা জানালা দিয়ে বাগানে ফেলে দাও তো।

মল্লিকা সুহাসের নির্দেশ পালন করল।

সুহাস তখন ছুটো ট্যাবলেট এনে বললে, নিন, এই ট্যাবলেট ছুটো খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

অসিত মৃদুকণ্ঠে বলে, ঘুমের ওষুধ—কিন্তু ওষুধটা কি রকম গাঢ় সবুজ ছিলো আপনি দেখেছেন ডাঃ চক্রবর্তী—

দেখেছি—ওটার রং অমনিই—নিন এই ট্যাবলেট ছুটো খান, খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

এবারে আর অসিত আপত্তি করে না—ট্যাবলেট ছুটো সুহাসের হাত থেকে নিয়ে খেয়ে ফেলে।

That's good—সুহাস বলে, এবারে শুয়ে পড়ুন।

সুহাসের কথার আর কোন প্রতিবাদ করে না অসিত। শুয়ে পড়ে।

চলুন ভবানী দেবী—ঘরের আলোটা নিভিয়ে দাও মল্লিকা।

আগে আগে ভবানী দেবী ও পশ্চাতে সুহাস ঘর থেকে বের হয়ে এলো। মল্লিকা ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল।

পরের দিন এক সময় সুহাস মল্লিকার কাছ থেকে গত রাত্রের ব্যাপারটা জেনে নেয়। এমন কি সেদিন সন্ধ্যায় অসিতের সঙ্গে বাগানে যে সব কথা হয়েছিল তাও বলে মল্লিকা। সব শোনার পর সুহাস বলে, হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও—ও একলা আছে—একলা ওর থাকা ভাল নয়।

মল্লিকা চলে গেল।

সুহাস কিন্তু মনে মনে যতই গত সন্ধ্যা ও রাত্রের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে কেন যেন তার মনে হয়—গত রাত্রের ঘটনাটা আকস্মিক হলেও একেবারে অর্থহীন নয়।

কোথায় যেন একটা সত্যের বীজ নিহিত আছে।

হয়ত বা তারই সঙ্গে, অসিতের অবচেতন মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্বটা জড়িয়ে আছে বলে তাদের মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে কোথাও একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলেই ক্রমশঃ তার মনে একটা দৃঢ় ধারণা জন্মায়।

অসিত তার বাপকে অত্যন্ত ভালবাসত। ভবানী দেবী ওর মার মুখেই শোনা কথাটা। খুব ছোটবেলা তার বাপের মৃত্যু হয়েছিল এবং অসিতের বাবা কুমুদশঙ্করের জলসাঘরের মধ্যে নাকি এক রাত্রে হঠাৎ মৃত্যু হয়; কোথায় ছিল সে তখন কে জানে, হঠাৎ ছুটে এসে সে জলসাঘরে ঢোকে এবং মৃত বাপকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যায়—তারপর ধুম জ্বর—জ্বরে অনেকদিন ভুগেছিল অসিত।

হয়ত অসিতের অবচেতন মনের মধ্যে আজও কোথাও বাপের সেই মৃত্যুর ব্যাপারটা যেটা সেদিন তার বালক-মনে প্রচণ্ড একটা আঘাত হেনেছিল সেটার স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি।

এবং যে কথাটা হয়ত সে নিজেও জানে না, বোঝে না।

তার পর ভবানী দেবীর মুখেই শোনা সুন্দরী সুবেশা নারীর প্রতি অসিতের বরাবর একটা বিতৃষ্ণা।

সে বিতৃষ্ণাই বা কেন ?

তার মূলে কি কোন কিছু রয়েছে ?

আর ঐ বিষ!

হঠাৎ মনে হলো কেন অসিতের যে ঔষধটা বিষ।

হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে ভেঙ্গে দিল কেন কাপটা ও!

বিষের প্রতি একটা ভয়—একটা আতঙ্ক নিশ্চয়ই ওর মনের মধ্যে কোথায়ও বাসা বেঁধে আছে।

সুন্দরী সুবেশা তরুণীর প্রতি বিতৃষ্ণা—বাপের প্রতি তীব্র ভালবাসা—ঐ বিষের আতঙ্ক—

ছবি-আঁকা—পুতুল-প্রীতি—কম কথা বলা—নির্জনতা-প্রিয়তা—সব

কিছু মিলে যা ওকে আজো হয়ত একজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষে পরিণত হতে দেয় নি।

এগুলো সব কি পরস্পর-বিরোধী না একের সঙ্গে অন্যের ঘনিষ্ঠ কোন যোগাযোগ আছে কোথায়ও!

ঐ দিন দ্বিপ্রহরে আবার সুহাস অনেকক্ষণ ধরে ডাঃ দের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করে।

ডাঃ দে বলেন, তোমার ধারণাই হয়ত ঠিক সুহাস—ঐ সব কিছু নিয়েই হয়ত ওর অবচেতন মনে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, যেজন্য ও স্বাভাবিক নয়—natural নয়—

তার পরই একটু থেমে ডাঃ দে আবার বলেন, ওর অতীত জীবন-টাকে আমাদের যতটা সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে হবে সুহাস। ওর মাকে প্রশ্ন কর—করালীচরণ ঐ বাড়ির অনেক দিনের পুরানো চাকর, সেও হয়ত অনেক কথা জানতে পারে অসিত সম্পর্কে—তাকেও প্রশ্ন করে দেখ যদি কোন কিছু জানতে পারা যায়।

দীর্ঘ একটানা নিদ্রার পর অসিত যখন চোখ মেলল—তাকে তখন বেশ প্রসন্ন ও খুশি-খুশি মনে হয়।

তার মুখের দিকে চেয়ে মল্লিকার যেন আদৌ মনে হয় না গতরাত্রে অমন একটা ব্যাপার করেছে অসিত।

মল্লিকার বরং মনের মধ্যে একটা ভয় ছিল—কি জানি সকালে ঘুম ভাঙবার পর অসিত কি করবে! আবার কেমন ব্যবহার করবে!

কিন্তু তাকে হাসি হাসি মুখে চেয়ে থাকতে দেখে মল্লিকা বলে, চা আনি—

চা?

হ্যাঁ—হাত মুখ ধুয়ে নিন আপনি, চা নিয়ে আসি আমি।

অসিতকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে মল্লিকা চা আনতে যায়।

বারান্দায় ভবানী দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মল্লিকার।

ভবানী দেবী জিজ্ঞাসা করেন, খোকন উঠেছে?

হ্যাঁ।

কেমন আছে ?

মনে তো হলো বেশ শান্ত।

কোথায় যাচ্ছো ?

ওঁর চা'টা নিয়ে আসি।

তুমি বরং ঘরে যাও, আমি করালীর হাতে চা'টা পাঠিয়ে দিচ্ছি—

মল্লিকা ফিরে গেল।

ঘরে ফিরে এসে দেখে ইতিমধ্যে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসেছে অসিত। একটা পিয়ানো বাজানো পুতুল—দম দিলেই টুং টুং করে একটা সুর বাজে, সেটায় দম দিয়ে বাজিয়ে দিয়েছে—সেটা বাজছে।

অসিত ইজেলটার সামনে দাঁড়িয়ে মল্লিকার অর্ধসমাপ্ত ছবিটায় তুলি বুলাচ্ছে।

মল্লিকা লক্ষ্য করেছিল বাজনা জিনিসটা অসিতের প্রিয়। কথাটা সে একদিন সুহাসকে বলেছিল—সুহাস তাই একটা রেডিও সেট এনে অসিতের ঘরে বসিয়ে দিয়েছিল।

রেডিও সেটটা ঘরে আনা অবধি মধ্যে মধ্যে চাবিটা ঘুরিয়ে দিত মল্লিকা—বিশেষ করে কোন সেতার বা ঐ জাতীয় কোন বাজনা প্রোগ্রাম থাকলে সেই প্রোগ্রাম দেখে।

মল্লিকা লক্ষ্য করেছে অসিত তাতে খুশিই হয়েছে।

আজো পুতুলের বাজনাটা থেমে যেতেই মল্লিকা রেডিওর চাবীটা হঠাৎ ঘুরিয়ে দিল।

প্রোগ্রামটা জানত না মল্লিকা।

কোন বাজনা নয়—উচ্চাংগের সংগীত ছিল তখন।

ভরাট পুরুষ গলায় কোন শিল্পী গাইছে।

চকিতে অসিত ঘুরে দাঁড়ায়।

গানের প্রতি সে যেন আকৃষ্ট হয়েছে মনে হয়। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় রেডিওর সামনে।

ভরাট পুরুষ গলা হলেও অদ্ভুত সুরেলা ও মিষ্টি।

গাইবার ঢংটিও ভারী চমৎকার।

সারেঙ্গী ও তবলার সঙ্গে গাইছে শিল্পী।

করালী চা নিয়ে আসে—ট্রেতে করে।

দেখে ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু'জনে যেন একমনে রেডিওর গান শুনছে। চায়ের ট্রে-টা নামিয়ে রেখে চলে যায় করালী।

॥ ২৩ ॥

দিন দুই বেশ শান্তিতেই কাটলো।

কিন্তু তৃতীয় দিনে হঠাৎ আবার একটা ঘটনা ঘটলো।

দুপুরে অসিত বসে বসে মল্লিকার ছবি আঁকছিল—আর অল্প দূরে একটা চেয়ারে বসে মল্লিকা সিটিং দিতে দিতে একটা বাংলা মাসিক পড়ছিল।

দুপুরে ফলের রস খাবে অসিত—এক সময় হাতের ম্যাগাজিনটা চেয়ারের উপর রেখে মল্লিকা ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছে আর ইতিমধ্যে কখন এক সময় অসিত এসে চেয়ার থেকে ম্যাগাজিনটা তুলে নিয়ে ওল্টাতে শুরু করে দিয়েছে।

ম্যাগাজিনের মধ্যে একটি সুন্দরী সালঙ্কারা বধূর ফটো ছিল—হঠাৎ সেই ছবিটা পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখে পড়তেই অসিত যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যায়।

ভ্রূ দুটো তার কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। আর ঠিক সেই সময় মল্লিকা ফলের রস নিয়ে এসে ঘরে ঢোকে।

অসিত ম্যাগাজিনের মধ্যে ফটোটা হিংস্রভাবে একটানে ছিঁড়ে বইটা সামনের দিকে ছুঁড়ে দেয়।

অতর্কিতে গিয়ে সেটা মল্লিকার মুখে আঘাত করে—হাত থেকে ফলের রসভর্তি গ্লাসটা ঝন ঝন করে মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে যায়।

অসিত ছুটে আসে আবার বইটা তোলার জন্য—হুমড়ি খেয়ে পড়ে মল্লিকার উপরে—মল্লিকা দু'হাতে অসিতকে জড়িয়ে ধরে।

না, না—অসিত অস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে।

কি—কি হলো—অমন করছেন কেন?

অসিত নিজেকে মল্লিকার বাহু থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে আর মল্লিকা প্রাণপণে অসিতকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে তার দুই বাহু দিয়ে।

অসিত শোন, শোন—অমন করছো কেন—ওটা একটা ছবি—একটা ফটো—লক্ষ্মীটি শোন—

আচমকা পরস্পরের বাহুবন্ধনের মধ্যেই কি হলো অসিতের সে শান্ত হয়ে গেল। মল্লিকার মুখের দিকে তাকালো অসিত।

মল্লিকা তখনো দু'বাহু দিয়ে নিবিড় করে অসিতকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাঁপাচ্ছে পরিশ্রমে।

অসিত স্থির—শান্ত—নিশ্চল।

মল্লিকার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

অসিতের চোখে ক্ষণপূর্বের সেই হিংস্র কুটিল দৃষ্টি আর নেই—বরং যেন দু'চোখের দৃষ্টিতে তার একটা বিস্ময়।

মল্লিকা তখনো হাঁপাচ্ছে।

কয়েকটা মুহূর্ত ঐভাবেই অসিতকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরই এক সময় বুঝি খেয়াল হয়।

হাত দুটো শিথিল হয়ে যায়।

মাথাটা সে নীচু করে। কপোল রাঙা হয়ে উঠেছে তার।

চলুন বসবেন ঐ চেয়ারটায়—মল্লিকা ধীরে ধীরে এক সময় বলে।

অসিত শান্ত হয়ে চেয়ারটার উপর বসে।

ঘরময় কাচের টুকরো—মল্লিকা একটা একটা করে কাচের টুকরো-গুলো মেঝে থেকে কুড়োতে থাকে।

অসিত মল্লিকার দিকে চেয়ে থাকে।

একবার মল্লিকা চোখ তোলে, দেখে অসিত স্থির দৃষ্টিতে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে।

আবার গ্লাসে করে ফলের রস তৈরী করে আনে মল্লিকা।

অসিত তখনো বসে আছে চুপটি করে।

নিন খেয়ে নিন এটা—

অসিত হাত বাড়িয়ে মল্লিকার হাতটা চেপে ধরে।

মল্লিকা ভয় পেয়ে যায়, তবুও সাহস এনে বলে, হাত ধরলেন কেন—এটা খেয়ে নিন—হাত ছাড়ুন।

মল্লিকার হাতটা ছেড়ে দিয়ে অসিত ফলের রসটা খেয়ে নেয়।

গ্লাসটা রেখে পাশে এসে দাঁড়ায় মল্লিকা।

কি হয়েছিল বলুন তো—ফটোটা অমন করে ছিঁড়লেন কেন ?

জানি না—আমার—আমার মাথার মধ্যে যেন কেমন করে উঠলো মল্লিকা।

কি করে উঠলো ?

তা জানি না—মনে হলো—মনে হলো মুখটা যেন আমার চেনা—

চেনা ?

হ্যাঁ—ওকে যেন আমি চিনি—

ওকে চিনবেন কি করে, ও তো এক অভিনেত্রীর ফটো।

অভিনেত্রী—

হ্যাঁ, নামকরা একজন অভিনেত্রী। কেন সিনেমা থিয়েটারে কখনো দেখেন নি ওকে ?

না তো—

মল্লিকা আর প্রশ্ন করে না।

সুহাসকে ঐ দিন সন্ধ্যায় সমস্ত ব্যাপারটা মল্লিকা বলতে সুহাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, মল্লিকা কাল গ্লোবের দুটো টিকিট কেটে আনবো—তুমি ওকে নিয়ে সিনেমায় যাও।

সিনেমায় যাবো, সেখানে যদি—

কিছু ভয় নেই, তুমি যাও না।

সত্যিই ভয় করছিল মল্লিকার একা একা অসিতকে নিয়ে সিনেমায়

যেতে। বাড়ির বাইরে অত লোকের মাঝখানে যদি দেখতে দেখতে কোনরকম হঠাৎ কিছু করে বসে, তখন সে অসিতকে সামলাবে কি করে!

কিন্তু দেখা গেল অসিত একেবারে চুপচাপ।

ইংরাজী বই—ঐ দেশেরই গল্প।

এক স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে গল্প। নতুন বিয়ের পর তারা এসে ছোট একটি ফ্ল্যাটে সংসার পেতেছে দুজনে দুজনকে নিবিড় ভাবে পাবার জন্য।

স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা—প্রেম—আনন্দোচ্ছল মুহূর্ত—ছবিটির সবটাই প্রায় ভরা।

অন্ধকারে অসিত পাশে বসে আছে—বোঝবার ঠিক উপায় নেই, কিন্তু মল্লিকা যেন কেমন নিজে একটা অস্বস্তি বোধ করে।

অন্ধকারেও তার কপোল লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে থাকে।

ইণ্টারভ্যালের পর ছবি শুরু হয়েছে, একটানা চলেছে।

একবার যেন মল্লিকার অন্ধকারে মনে হলো অসিত তার পাশে একটু ঘন হয়ে এসেছে।

অন্ধকারেই কখন অতঃপর পরস্পর পরস্পরের হাত চেপে ধরেছে দুজনারই কারো খেয়াল হয় না।

এক সময় ছবি শেষ হলো।

হলে আলো জ্বলে উঠলো।

অসিত চুপ করে বসে তখনো।

মল্লিকা ডাকে, উঠবেন না? চলুন—ছবি শেষ হয়ে গিয়েছে—

অসিত উঠে দাঁড়াল।

রাত্রে বাড়িতে ফিরে অসিত খেতে বসেছে—পাশে দাঁড়িয়ে মল্লিকা পরিবেশন করছে।

অসিত চুপচাপ—অসম্ভব চুপচাপ। খাচ্ছে না, খাদ্যবস্তু নিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে নাড়াচাড়া করছে।

কি হলো, খান!

তুমি খাবে না ?

খাবো—পরে।

না—তুমিও আমার সঙ্গে বোস।

আমিও বসবো ?

হ্যাঁ—জুলি আর ডেভিড্ কেমন একসঙ্গে বসে খাচ্ছিল দেখছিলে না ! এসো বোস—ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোস।

আচ্ছা, আপনি তো খেয়ে নিন—

না—তুমিও খাবে।

কিছুতেই মানে না অসিত। শেষ পর্যন্ত মল্লিকাকে বসতেই হয়।

খেতে খেতে এক সময় একটা চপ তুলে অসিত মল্লিকার মুখে গুঁজে দেয়, এটা খাও—

না, না—ওটা আপনি খান।

মুখটা সরিয়ে নেয় মল্লিকা।

হঠাৎ উঠে পড়ে একপ্রকার জোর করেই অসিত মল্লিকাকে চপটা খাওয়াবার চেষ্টা করে। মল্লিকা বাধা দেয়—অসিত খাওয়াবেই।

বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে মল্লিকাকে তার মুখে চপটা গুঁজে দেয় অসিত।

মল্লিকাকে বাধ্য হয়ে চপটা খেতেই হয়।

খাওয়া এক সময় শেষ হয়—হাত মুখ ধুয়ে আসে অসিত। মল্লিকা বলে, আপনি শুয়ে পড়ুন আমি আসছি।

মল্লিকা প্লেটগুলো তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে মল্লিকা একটু যেন অবাকই হয়ে যায়।

অসিত শোয়নি। শয্যার উপর চুপটি করে বসে আছে।

একি ! শোননি ? মল্লিকা প্রশ্নটা করে অসিতের মুখের দিকে তাকায়।

কিন্তু অসিতের চোখে চোখ পড়তেই মুখের কথা যেন অর্ধসমাপ্তই থেকে যায় মল্লিকার।

অসিতের চোখ দুটি চক্ চক্ করছে।

এ তো সেই নির্বোধ সরল চাউনি নয়। শিশুর মত নিষ্পাপ চাউনি নয়, অসিতের যে চাউনির সঙ্গে এতদিন পরিচিত মল্লিকা।

কয়েক মুহূর্ত যেন অসিতের চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারে না মল্লিকা।

কেমন যেন এক সম্মোহনে তাকে তার অজ্ঞাতেই আবিষ্ট করে ফেলেছে।

মল্লিকা—

কি ?

তুমি শোবে না ?

শোবই তো।

এই ঘরে তুমি শোবে।

এই ঘরে!

হ্যাঁ—আমার এই বিছানায়—যাও আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এসো।

তা হঠাৎ আজ এ খেয়াল কেন! নিন শুয়ে পড়ুন—আমি আলো নিভিয়ে দেবো'খন—ঐ যাঃ আপনার ওষুধটাই তো দেওয়া হয়নি, শোবার আগে আপনার যেটা খাবার কথা।

মল্লিকা এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে ঘুমের ওষুধের পিলটা নিয়ে এলো ও এক গ্লাস জল।

নিন—জলটা খেয়ে নিন—

না—ওষুধ খাবো না।

বাঃ, তা বললে কি হয়—ডাঃ চক্রবর্তী রাগ করবেন—আমাকে বকবেন—নিন খেয়ে নিন।

খাচ্ছি, তুমি এ ঘরে শোবে—

শোব—নিন।

শোবে তো ?

বললাম তো শোব।

অসিত অতঃপর ওষুধটা খেয়ে নেয়।

নিন এবারে শুয়ে পড়ুন।

তুমি আমাকে আপনি করে বল কেন মল্লিকা? হঠাৎ প্রশ্ন করে অসিত।

তবে কি বলবো?

কারো বৌ বুঝি আপনি বলে!

আচ্ছা বেশ, আপনি আর বলবো না। শুয়ে পড়।

তুমি শোবে না?

বললাম তো শোব। তুমি শোও—আমার একটু কাজ আছে—

কি কাজ?

আমি স্নান করবো—তুমি শুয়ে পড়ো, আমি স্নানটা সেরে আসি।

এত রাত্রে স্নান!

বাঃ, আমি তো রোজ স্নান করি রাত্রে—শোও—আমি আসছি স্নান করে।

এবারে আর অসিত প্রতিবাদ করে না। শুয়ে পড়ে।

আমি আসছি।

দেরী করো না কিন্তু—

না—দেরী করবো না।

আলোটা এখন থাক জ্বালা—তুমি এসে নিভিও।

মল্লিকা ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

মল্লিকা সত্যিই রাত্রে শোবার আগে স্নান করে। অসিত ঘুমিয়ে পড়লে তবে সে যেত স্নান করতে।

মল্লিকা একটু বেশি সময়ই বাথরুমে থাকে।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে। স্নান করে একটা হাল্কা রঙিন শাড়ি পরে ঘরের থেকে বের হতেই কানে এলো বেহালার সুর।

সুহাস ঘুমোয় নি এখনো—বেহালা বাজাচ্ছে।

আজকের সব কথা সুহাসকে বলতে হবে। এগিয়ে যাচ্ছিল মল্লিকা সুহাসের ঘরের দিকে কিন্তু হঠাৎ যেন পা দুটো তার থেমে যায়।

কিসের একটা লজ্জা—সংকোচ যেন তার দুটি পায়ের সমস্ত গতি হরণ করে নিয়েছে।

এগুতে আর পারে না মল্লিকা।

বারান্দায়ই দাঁড়িয়ে থাকে একা একা।

নির্জন নিস্তব্ধ রাত।

সবাই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু কোথায় চলেছে সে—স্বামীর শয়নকক্ষে! সে জন্য কেন এত লজ্জা! চলতে পারছে না কেন সে?

এমন তো কোন দিনও তার হয় নি—আজই বা কেন তার সমস্ত শরীর কাঁপছে!

সুহাস কি সুর বাজাচ্ছে বেহালায়!

মোহিনী না?

ছি ছি, কেউ যদি দেখে এখানে সে এমন করে দাঁড়িয়ে আছে! ভবানী দেবী বা মায়াদি যদি দেখতে পায়!

মল্লিকা স্খলিত পায়ে গিয়ে অসিতের ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরের আলো জ্বলছে।

অসিতের দিকে তাকাল মল্লিকা—অসিত ঘুমিয়ে পড়েছে। পা টিপে টিপে মল্লিকা অসিতের শয্যার পার্শ্বে এসে দাঁড়াল।

অসিত ঘুমোচ্ছে।

ঘুমন্ত মুখে যেন একটা হাসির ঢেউ।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মল্লিকা অসিতের মুখের দিকে। কয়েকগাছি চূর্ণ কুন্তল কপালের উপরে এসে বিন্দু বিন্দু ঘামের সঙ্গে লেপটে আছে।

মল্লিকা যেন কিছুতেই তার চোখের দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। ইচ্ছা করে হাতের আঙ্গুল দিয়ে আলতো ভাবে ঘামে ভেজা চুলগুলো সরিয়ে দেয়।

হাতটা এগিয়ে যায়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না। অর্ধপথেই থেমে যায় দুর্লংঘ্য এক সংকোচে যেন।

সুহাসের বেহালার সুর শোনা যায়।

বোধহয় ইমন কল্যাণ।

সহসা যেন শিউরে উঠে মল্লিকা পিছিয়ে আসে। ভাগ্যিস অসিতকে স্পর্শ করেনি—যদি ঘুম ভেঙ্গে যেত।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল মল্লিকা।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরটা যেন অন্ধকারে ডুবে গেল।

ইমন কল্যাণের সুর ভেসে আসছে। মল্লিকা এসে জানালার সামনে দাঁড়াল—ঘরেও অন্ধকার বাইরেও অন্ধকার।

সহসা মল্লিকার দুচোখের কোল জলে ভরে যায়।

এ তার কি হলো!…

কিন্তু আশ্চর্য!

পরের দিন থেকে অসিত আবার গম্ভীর। অসম্ভব গম্ভীর। একটাও কথা বলছে না। অসিতের ঐ চুপচাপ গম্ভীর ভাব দেখলেই মল্লিকার বুকের ভিতরটা যেন কেমন কেঁপে ওঠে। মনে হয় যেন আবার কোন ঝড়ের পূর্বাভাস।

মল্লিকা শুধায়, কি হলো, একেবারে যে চুপচাপ!

আচ্ছা মল্লিকা—

কি?

ডাক্তার আমার সম্পর্কে কি বলছেন?

কি আবার বলবেন!

বলেন না, আবার আমি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারি—

না তো। বরং বলেছেন আর কখনো তুমি অজ্ঞান হবে না।

ডাক্তার জানে না।

জানে না?

না। দুবার হয়েছি—আবারও হয়তো হবো।

না, আর হবে না।

না, না—হবো আমি জানি। তারপরই একটু থেমে বলে, সত্যিই

যদি আবার অজ্ঞান হয়ে যাই—আমি তো কিছুই জানতে পারব না, কিন্তু তুমি চলে যাবে না তো ?

চলে যাবো কেন !

না যেও না।—বলতে বলতে অসিত তাকায় মল্লিকার দিকে—আবার সেই আগুন দেখতে পায় যেন মল্লিকা অসিতের দু'চোখের দৃষ্টিতে।

॥ ২৪ ॥

সুহাস বুঝতে পারছিল অসিত কিছুতেই স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারছে না। আর পারবেও না হয়ত।

জীবনের পাতায় যেন কোথায় ওর একটা অন্ধকার আছে এবং যে অন্ধকারের স্মৃতি ওর অবচেতন মনের অনেকটা এমন ভাবে জুড়ে আছে যে ওর অজ্ঞাতেই এগুতে গেলেই ও ঠোক্কর খাচ্ছে।

থমকে দাঁড়াচ্ছে যেন। অথচ ও বুঝতে পারছে না।

তাছাড়া সেদিন মল্লিকা বলছিল, সুহাস, আমার যেন কেমন ভয় করে আজকাল ওকে—

ভয় ! কিসের ভয়—সুহাস ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

জানি না, তবে—বলতে গিয়েও যেন ইতস্ততঃ করে মল্লিকা। একজন নারীর পুরুষের বিশেষ চোখের চাউনি চিনতে কখনো ভুল করে না—মল্লিকারও ভুল হয়নি—কিন্তু সে কথা সুহাসকে কেমন করে স্পষ্ট করে বলবে ও !

কি তবে মল্লিকা—সুহাস আবার প্রশ্ন করেছিল।

ও যেন—ও যেন কেমন করে আমার দিকে চেয়ে থাকে—চোখের সেই সরল শিশু চাউনি যেন আর নেই, তাছাড়া আর একটা জিনিস লক্ষ্য করছি আমি ঐ সঙ্গে—তোমাদের হয়ত কারোরই নজর পড়েনি—

কি ?

ওর সেই পুতুল ও ছবির প্রতি অখণ্ড মনোযোগ যেন আর নেই। ও যেন ঠিক আগের মত ঐ সব নিয়ে ঠিক খুশি—তৃপ্ত হতে পারছে না। আমাকে যেন এক মুহূর্তও কাছ-ছাড়া করতে চায় না—আমার বড় ভয় করছে সুহাস—আবার সেরকম কিছু হবে না তো!

না—তোমার ভয় নেই মলি—হয়ত এতদিন পরে সত্যি সত্যিই ও একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠছে একটু একটু করে। ওর মনের অন্ধকারটাকে ও অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে—

মল্লিকা মুখ ফুটে স্পষ্ট করে সব না বললেও সুহাসের বুঝতে কষ্ট হয় নি যে কোন ভাবেই হোক মল্লিকার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে অসিতের এতদিনের যে কিছুটা অপরিণত মত সেটা যেন ক্রমশঃ 'এডোলেসেন্সে'র দিকে এগিয়ে চলেছে। মনের মধ্যে তার যে স্বাভাবিক পরিবর্তনটা এতদিন বয়স হওয়া সত্বেও আসেনি সেটাই এতদিনে হয়ত আসছে—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ও ওকে অভিভূত করে ফেলেছে—ওর অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে সচেতনতা। আর সব চাইতে বড় ভয় ওর বোধ হয় যেন আবার যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে হয়ত মল্লিকাকে ওর হারাতে হবে। অথচ মল্লিকা যে ওর কি এবং কতটা সেটা বুঝবার মত মনের স্বাভাবিকতাও ওর নেই।

সেই রাত্রেই ভবানী দেবীকে সুহাস তার ঘরে ডেকে পাঠায়।

ভবানী দেবী যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়েই ঘরে ঢোকেন।

কি হয়েছে সুহাস?

সুহাস ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে করতে বলে, বসুন মা! আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে—

ভবানী দেবী কিন্তু বসলেন না। দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোখে মুখে যেন একটা স্পষ্ট উদ্বিগ্ন ভাব।

বসুন মা—

কি বলবে তুমি বল বাবা—আমি এখন গিয়ে পুজোয় বসবো—এখানে আর বসবো না। ভবানী দেবী বলেন।

অসিতবাবু সম্পর্কেই কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে আমি করবো মা।

অসিত!

হ্যাঁ—দেখুন অসিতবাবুর কথাবার্তা ব্যবহার দেখে আমাদের মনে হচ্ছে ওর অবচেতন মনের মধ্যে যেন কোথায় একটা অন্ধকার জোট পাকিয়ে আছে এবং তার মূলে আছে নিশ্চয়ই আমাদের মনে হয় এবং যেটা এই সব কেসে স্বাভাবিক হয়ত ওর ছোট বেলার কোন ঘটনা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে—যেটা হয়ত ওর ভাল করে মনেও নেই আজ।

ভবানী দেবী কোন কথা বলেন না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সুহাস বলে, ওর চরিত্রের মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা রয়েছে একে সম্পূর্ণ ভাবে দূর করতে হলে ওর জীবনের সমস্ত ঘটনা আমার জানা দরকার।

আমি তো তোমাকে সবই বলেছি সুহাস। মৃদু শান্ত কণ্ঠে জবাব দেন ভবানী দেবী।

বলেছেন কিন্তু তাহলেও মনে হচ্ছে বিশেষ করে দুটো ব্যাপার—যার মূলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন কার্যকারণ আছে। সুন্দরী সুবেশা স্ত্রীলোকের প্রতি ওর বিতৃষ্ণা—আর ঐ যে মধ্যে সেদিন হঠাৎ বিষ বিষ বলে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল—আচ্ছা মা এমন কি কোন ঘটনা ওর ছোট বেলায় কোন সময় ঘটেছিল যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কোন সুন্দরী সুবেশা স্ত্রীলোক—বলুন মা যদি কিছু জানেন—কারণ জানবেন ছোট বেলার অনেক ব্যাপার মানুষের জীবনে এমন গভীর ভাবে আঁচড় কাটে যে সে দাগ সময়ও মুছে ফেলতে পারে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন ভবানী দেবী।

সুহাস আবার বলে, মা—আপনার ছেলেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে আমরা হয়ত আবার পারব কিন্তু—

সবই তোমায় আজ বলবো বাবা—যদিও সে গভীর লজ্জার কাহিনী —তবু বলবো—আমার বাবা ছিলেন একজন পণ্ডিত অধ্যাপক—বিয়ের

পরে যখন রায়বাড়িতে এলাম—তখন ঠিক জানতে পারিনি—ভবানী দেবী ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—ক্রমে ক্রমে জানতে পারলাম—

বলুন মা—থামলেন কেন।

আমার স্বামী ধনীর একমাত্র ছেলে, হাতে প্রচুর ধনসম্পত্তি—মাথার উপর কোন অভিভাবক নেই—অনেক দিন থেকেই ছিল তাঁর গান বাজনার শখ—শুধু শখ নয় নিজেও তিনি খুব ভাল গাইতে পারতেন—রায়বাড়ির জলসাঘরে প্রায়ই গানের জলসা বসতো—রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত সে জলসা চলত। কথাটা অবিশ্যি বিবাহের সময় জেনেছিলাম—সেজন্য কিছু আমার মনে হয় নি কিন্তু যে কথাটা সেদিন শুনিনি কিন্তু ক্রমশঃ জানতে পারলাম, সেটা শুধু ঐ সংগীতের প্রতিই আসক্তি নয় আর একটি বস্তুর প্রতিও তাঁর প্রবল আকর্ষণ আছে—মদ্যপান।

কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর যেন থামলেন কথা বলতে বলতে ভবানী দেবী—মনে হলো সুহাসের তিনি যেন নিজেকে একটু গুছিয়ে নিচ্ছেন।

প্রথম যেদিন জানতে পারলাম কথাটা সুস্পষ্টভাবে—উনি মদ্যপান করেন—রাত জেগে ওঁর প্রতীক্ষায় বসেছিলাম—স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন।

ভাল করে দাঁড়াতে পারছেন না। টলছেন—

ভয় পেয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, শরীরটা কি তোমার অসুস্থ!

ভবানী—ঘুমোও নি বুঝি এখনো ?

না—তোমার কি হয়েছে ? এগিয়ে গিয়েছি সামনে আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র একটা কটু গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দিল। থমকে দাঁড়ালাম আমি।

তুমি মদ খেয়েছো!

হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন স্বামী।

তুমি জানতে না বুঝি! স্বামী হাসি থামিয়ে বললেন।

তুমি মদ খাও ?

ভাল কথা বললে বটে—অধ্যাপক-কন্যা! কেন শোননি, লোকেরা

বলে রায়বাড়ির পুরুষেরা মদের গ্লাস নিয়ে জন্মায়—আবার একদিন শেষ বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে যখন মদের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়েই দুটি চোখ বোজে। বুঝলে—এই হচ্ছে রায়বাড়ির বংশানুক্রমিক ঐতিহ্য—

আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম। একটা মাতাল আমার স্বামী—

কি হলো একেবারে যে আলমারির কাচের পুতুলটি হয়ে গেলে! দেখো একটা কথা বলি, খুব দুঃখ পেলে বুঝি—এ বাড়ির বৌদের স্বামীর চরিত্র নিয়ে কখনো নেকামী করতে শুনেছি বলে জানি না—কাজেই সে চেষ্টা করলে তোমাকে সেজন্য দুঃখই পেতে হবে জেনো।

আমি কোন জবাব দিলাম না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিলাম তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা হাহাকারে বুকটা যেন আমার ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল তখন।

স্বামী আর আমার জন্য অপেক্ষা করলেন না—শয্যায় গিয়ে গা ঢেলে দিলেন। এবং একটু পরে নাক ডাকাতে শুরু করলেন।

আমার জীবনের সমস্ত সুখের স্বপ্ন যেন মুহূর্তে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল। তবু জান সুহাস, পরে আমার মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, কত জনার স্বামীই তো মদ্যপান করে এবং মদ্যপানই তিনি করেন আর তো কোন দোষ নেই চরিত্রে—তারপর একদিন খোকন আমার কোল জুড়ে এলো।

রায়বাড়িতে সত্যিই যেন আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম এমন সময় খোকন আমার বুকে আসায় আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম—আমার সমস্ত দুঃখ লজ্জা যেন ভগবানের দেওয়া সেই সান্ত্বনায় ভুলিয়ে দিল। খোকন ক্রমশঃ একটু একটু করে বড় হতে লাগল, আর যত সে বড় হতে লাগল আমাদের মা ও ছেলেকে নিয়ে যেন নতুন একটা সংসার গড়ে উঠতে লাগল। আমি আর খোকন—খোকন আর আমি।

অসিতবাবুর বাবা?

মধ্যে মধ্যে ছেলেকে আদর করত কিন্তু যে ভালবাসা ও প্রীতির আকর্ষণে বাপ ও ছেলের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা

কোনদিনই গড়ে ওঠে নি—কারণ সারাটা রাত জলসাঘরে কাটিয়ে শেষরাত্রের দিকে সেই যে তিনি ঘরে এসে শয্যায় শুয়ে পড়তেন পরের দিন দ্বিপ্রহরের আগে তো ঘুমই ভাঙ্গত না। তারপর আবার সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সাজগোজ করে ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন। ছেলে তার বাপকে দেখতো হয় শয্যায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে—না হয় জলসাঘরে যাবার জন্য প্রস্তুতিপর্ব চলেছে—কাজেই মধুর সম্পর্কটা গড়ে উঠতে হয়ত পারেনি বাপ ও ছেলের মধ্যে। তারপর তো ক্রমশঃ এমন হলো বাগানবাড়ি থেকে তিনি আর আসতেনই না।

বাগানবাড়ি ?

খোকনের তখন আট নয় বছর বয়স—কোথা থেকে এক বাঈজী এলো মজুরা নিয়ে গাইতে।

কি রকম দেখতে ছিল সে ?

আমি দেখিনি তাকে কখনো তবে শুনেছি চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স এবং দেখতে নাকি অপরূপ সুন্দরী ছিল।

তার পর ?

সেই যে বাঈজী এলো আর গেল না। বাগানবাড়িতে সে আশ্রয় নিল আর সেই থেকেই আমার স্বামীর বাড়ীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক যেন একেবারেই শেষ হয়ে গেল। দিবারাত্র হয় বাগানবাড়ীতে না হয় জলসাঘরেই কাটত তাঁর। ছেলের কাছে আমার যে সে কি লজ্জা তোমাকে তা আমি বোঝাতে পারব না সুহাস। যতই ছোট হোক সে তার মার প্রতি বাপের অবহেলাটা দেখেই হয়ত আরো নিবিড় করে আমাকে আঁকড়ে ধরে।

খুবই স্বাভাবিক—

ভবানী দেবী বলতে লাগলেন, ঐ সময় একদিন খোকন আমাকে নিজের ঘরে বসে কাঁদতে দেখে পাশে কখন এসে দাঁড়িয়েছে জানতে পারিনি।

হঠাৎ খোকনের ডাকে চমকে ফিরে তাকালাম।

মামণি—

কি বাবা!

কি হয়েছে মামণি—কাঁদছো কেন! খোকন দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে।

কই, আমি কাঁদিনি তো বাবা—ওকে আমি বুকে টেনে নিই।

হ্যাঁ, তুমি কাঁদছিলে—কেন কাঁদছিলে মামণি—

ভবানী দেবীর কথাটা শেষ হলো না সহসা রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার চিরে একটা দীর্ঘ চীৎকার শোনা গেল—না, না—আমি—আমি তা চাইনি—চাইনি—

একি, এ যে অসিতের গলার স্বর!

সুহাস ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

মল্লিকা আজকাল অসিতকে একা ফেলে তার ঘরে শুতে যেত না।

অসিত কখন ঘুম ভেঙ্গে ওঠে! উঠে যদি তাকে না দেখতে পায় হয়ত অসন্তুষ্ট হবে—কোন রকম বিভ্রাটও ঘটতে পারে।

অসিত ঘুমিয়ে পড়লে তাই সে শয্যার পার্শ্বে ইজিচেয়ারটা টেনে তাতেই গা ঢেলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিত।

আজ হঠাৎ অসিতের চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙ্গে যায় মল্লিকার—ছুটে যায় সে অসিতের শয্যায়।

থর থর করে কি এক গভীর উত্তেজনায় অসিত তখন শয্যার উপরে উঠে বসে কাঁপছে।

দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মল্লিকা অসিতকে, কি—কি—কি হলো—কি হয়েছে?

না—না—আমি তা চাইনি—আমি তা চাইনি মামণি—

কি, কি হলো? শোন—শোন—

কে?

আমি—আমি মল্লিকা—

অসিতের যেন হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে যায়।

মল্লিকা—

হ্যাঁ—কি হয়েছে ? স্বপ্ন দেখেছিলে বুঝি কিছু—

স্বপ্ন—হ্যাঁ—সেই—সেই স্বপ্নটা মল্লিকা ! অসিত বলে।

কোন্ স্বপ্নটা ?

সেই স্বপ্নটা—

ওরা কেউ লক্ষ্য করে না কখন এক সময় ঘরের মধ্যে প্রথমে সুহাস ও তার পিছনে ভবানী দেবী এসে দাঁড়িয়েছেন।

॥ ২৫ ॥

কোন্ স্বপ্ন—মল্লিকা আবার প্রশ্ন করে।

একটা ছেলে—যেন অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে বলতে থাকে অসিত থেমে থেমে, ছেলেটা রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতো—খুব সুন্দর লম্বা-চওড়া একজন লোক—জান সে ঠিক আমার বাবার মত দেখতে—

তোমার বাবার মত !

হ্যাঁ—আর তার সামনে বসে আছে একজন মেয়েমানুষ—দামী শাড়ি পরা—সারা গায়ে ঝলমল করছে কত গয়না—লোকটা থেকে থেকে হাতের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে—সেই মেয়েমানুষটার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে—ছেলেটা রাগে ফুঁসতে থাকত—

তার পর ?

তার পর জানি না—ঐ ছেলেটা—ঐ লোকটা—ঐ মেয়েমানুষটা ওরা—ওরা কে ! কেন ওদের বার বার আমি স্বপ্নে দেখি—চিনেও যেন ঠিক চিনতে পারি না ওদের—

ও কিছু না—

কে !

সুহাস এগিয়ে আসে, আমি সুহাস।

ডাঃ চক্রবর্তী !

হ্যাঁ—স্বপ্ন স্বপ্নই—

স্বপ্নই!

হ্যাঁ—আর কি!

কিন্তু ওরা—ওরা তিনজন ?

ওরাও স্বপ্ন—মিথ্যা—নিন—এই ঔষধটা খান। খেয়ে শুয়ে পড়ুন—বলে টেবিলের উপর থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে এগিয়ে দেয় সুহাস।

অসিত শান্ত হয়ে ট্যাবলেটটা খেয়ে নেয়।

আলোটা এবার নিবিয়ে দাও মল্লিকা—চলুন মা—আমরা বাইরে যাই।

ভবানী দেবীকে নিয়ে সুহাস ঘর থেকে বের হয়ে আসে। এবং বের হয়ে আসার সময় সুহাসই ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয়।

বাইরে বের হয়ে এসে সুহাস ভবানী দেবীকে প্রশ্ন করে, ঐ রকম স্বপ্ন কি আগেও উনি দেখেছেন।

হ্যাঁ—মৃদু কণ্ঠে জবাব দেন ভবানী দেবী।

অনেকবার ?

না—এই নিয়ে বোধ হয় বার পাঁচ ছয়!

সুহাস আর কোন প্রশ্ন করে না ভবানী দেবীকে। সে তার নিজের ঘরে ঢুকে যায়।

ঘরের মধ্যে এসে বেহালাটা হাতে তুলে নেয়।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বেহালার তারে ছড় টানে সুহাস।

সুহাসের হাতের বেহালায় দরবারী কানাড়ার সুর জাগে।

অন্ধকারে চোখ বুজে শুয়ে ছিল শয্যার উপরে অসিত। মল্লিকার একটা হাত সে বুকের উপর দু'হাতে মুঠো করে ধরে ছিল।

অন্ধকারে ভেসে আসে দরবারী কানাড়ার সুর। হঠাৎ যেন অসিত একটু কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কে—কোথা থেকে আসছে সুর মল্লিকা? অসিত চাপা গলায় প্রশ্ন করে।

সুহাস বেহালা বাজাচ্ছে—মল্লিকা বলে।

এই সুর—এই সুরটা যেন কবে আমি শুনেছিলাম! জানি—হ্যাঁ—সুরটা আমি জানি—

হয়ত তোমাদের বাড়িতে কখনো কাউকে বাজাতে বা গাইতে শুনেছো—মল্লিকা বলে।

বাড়িতে—আমাদের বাড়িতে—বাড়িতে তো মামণি কখনো গান বাজনা হতে দেয় না। করালীদা বলে, বাবার মৃত্যুর পর সেই যে রায়-বাড়ির জলসাঘরে চাবি পড়েছিল আর সে চাবি কোন দিন খোলা হয়নি—মা সে চাবি বাগানে যে দীঘিটা আছে তার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

মল্লিকা তখন হঠাৎ বলে, তবে হয়ত কোন দিন ছোট বেলায় তোমার বাবাকেই ঐ সুরটা গাইতে শুনেছো—

বাবাকে!

হ্যাঁ, তোমার বাবা তো শুনেছি খুব বড় একজন গাইয়ে ছিলেন—

বাবা—আমার বাবা—

হ্যাঁ—তোমার বাবা—বাবাকে তোমার মনে নেই?

ভাল মনে নেই—বাবা—আমার বাবা—উঃ মাথার মধ্যে আমার সেই যন্ত্রণাটা বুঝি শুরু হলো—

কি—কি হলো?

মল্লিকা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

সেই যন্ত্রণাটা—

কিছু হবে না—তুমি ঘুমাও আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই—

থামাতে বল না—ডাঃ চক্রবর্তীতে ঐ বাজনাটা থামাতে বল না—কাতর গলায় বলে অসিত।

বলে আসছি—আমি এখুনি বলে আসছি—

মল্লিকা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুহাসের ঘরে দ্রুতপদে এসে ঢোকে মল্লিকা, সুহাস!

মল্লি?

হ্যাঁ—ঐ সুরটা আর বাজিও না—বন্ধ কর।

কেন কি হলো ?

ঐ সুরটা তোমার শুনতে শুনতে অসিত যেন কেমন হয়ে গেল—

ঠিক আছে—তুমি যাও।

মল্লিকা ফিরে গেল। সুহাসও ঘর থেকে বের হয়ে মল্লিকাকে অনুসরণ করে।

ঘরে ঢুকে দেখে অসিত অন্ধকারে শয্যার উপর উঠে বসেছে, ছ'হাতে মাথাটা টিপে ধরে আছে।

কি হলো, উঠে বসেছো কেন ?

যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা—ক্রমেই বাড়ছে যন্ত্রণাটা—

সুহাস এসে ঘরে ঢোকে, কি হলো অসিতবাবু ?

যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা—

সুহাস তাড়াতাড়ি একটা ইনজেকশন দেয় অসিতকে। ধীরে ধীরে অসিত এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে—

মল্লিকা বলে, ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে—

হ্যাঁ, ঘুমাবে। কি হয়েছিল বল তো ?

মল্লিকা সংক্ষেপে তখন সে রাত্রের সব কথা সুহাসকে বলে।

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত—সেই স্বপ্ন থেকে দরবারী কানাড়া সুর শুনে অসিতের মাথার মধ্যে যন্ত্রণা—

পরের দিন সকালেই সুহাস টেলিফোন করে ডাঃ দে'কে সব জানায়।

সব শুনে ডাঃ দে বলেন, এবারে যেন অসিতের সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি সুহাস, ওর ঐ সুন্দরী সুবেশা স্ত্রী-লোকের প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণা—স্বপ্নের মধ্যে ঐ নারী ও দীর্ঘকায় এক পুরুষ ও একটি ছোট ছেলে—ছোট বেলায় যে মাকে ও গভীরভাবে ভালবাসত সেই মায়ের প্রতি ওর বাবার অবহেলা, যে কারণে হয়ত মায়ের প্রতি attachmentটা আরো গভীর হয়েছিল—সব ব্যাপার-

গুলো analysis করে দেখ—তাহলেই বুঝতে পারবে—সুন্দরী নারী মাত্রের প্রতিই বিতৃষ্ণা ও আক্রোশটা আর কিছুই নয়—একদা যে বাঈজী তার বাপকে তার মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, ঐ বিতৃষ্ণা ও আক্রোশটা তা থেকেই ওর শিশুমনের মধ্যে বাসা বেঁধে ক্রমশঃ একটা fixed illusionয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। এবং যে ব্যাপারটা সে আজো জানে না বা বুঝতে পারে না। কিন্তু তাহলেও এখনো তিনটে ব্যাপার খুব স্পষ্ট হচ্ছে না আমার কাছে।

কি স্যার?

ওর মনের একটা দিক অমন অপরিণত পরবর্তীকালে থেকে গেল কেন—বয়োবৃদ্ধির পরও—দ্বিতীয় ওর ঐ স্বপ্নের ব্যাপারটা এবং তৃতীয় ঐ বিষ। দেখো আমি ভাবছি ওকে নিয়ে গোটা দুই সিটিং দেবো।

কবে দেবেন স্যার?

কাল পরশুর মধ্যেই। তুমি ওকে নিয়ে আমার চেম্বারে একবার আসতে পারবে?

পারব।

তাহলে সেই কথাই রইলো।

ডাঃ দে অতঃপর ফোন ছেড়ে দিলেন।

সুহাসের একটা কথা মনে হয়—করালীচরণ রায়বাড়ির দীর্ঘদিনের চাকর।

অসিতের বাপের আমল থেকেই আছে।

করালীচরণ হয়ত অসিত সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারে।

ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে এক সময় সুহাস তার ঘরে করালীচরণকে ডেকে আনে।

আমাকে ডেকেছিলেন ডাক্তারবাবু?

হ্যাঁ করালী—তুমি তো এ বাড়িতে অনেক দিন আছো—

সে কি আজকের কথা ডাক্তারবাবু—বাবুর বিয়ের আগে থাকতে—

দেখ করালী—তোমার মার মুখে শুনছিলাম—এক সময় নাকি এক বাঈজী এসে রায়বাড়ির বাগানের মধ্যে যে রেস্ট হাউস ছিল সেখানে ছিল—

করালী মাথা নীচু করে।

দেখ করালী, তোমার দাদাবাবুকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তুলতে হলে আমার সেই বাঈজী সম্পর্কে কিছু জানা দরকার—

আমি আর কতটুকু জানি ডাক্তারবাবু!

একটা কথা তোমার দাদাবাবু কখনো সেই বাঈজীকে দেখেছিল কি?

দেখেছিল।

কি করে দেখলো!

একদিন দেখি বাগানঘরের জানালা দিয়ে দাদাবাবু উঁকি দিয়ে দেখছে—তাড়াতাড়ি দেখতে পেয়ে তাকে আমি সরিয়ে নিয়ে আসি।

তোমার মা জানেন সে কথা?

না—আরো একদিন—

কি?

সন্ধ্যাবেলা জলসাঘরে যখন বাবু বাঈজীতে নাচা-গাওয়া করছিলেন হঠাৎ আমার নজর পড়ে দাদাবাবু জলসাঘরের জানালা থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে—

তারপর?

ওকে সেদিনও আমি টেনে নিয়ে আসি—বলি, ওখানে উঁকি দিতে হয় না দাদাবাবু।

কেন?

না—বাবু জানতে পারলে বা মা জানতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না।

ঐ সুন্দরী মেয়েটা কে করালীদা?

ও কেউ নয়—

বাঃ, কেউ নয় মানে—দেখলাম বাবা গাইছেন—মেয়েটা নাচছে—কি সুন্দর সেজেছে—

ওসব কথা থাক—চল ঘরে চল।

ও কোথা থেকে এল করালীদা ?

তা শুনে কি করবে! চল ঘরে চল—

ওকে একদিন আমি বিষ দিয়ে মেরে ফেলবো—

সেকি!

হ্যাঁ—সেই যে মার কাছে গল্প শুনেছিলাম—রাজকুমার ডাইনীকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছিল—জান করালীদা সেও ঠিক এমনি—একটা ডাইনী খুব সুন্দরী এক কন্যা সেজে রাজাকে ভুলিয়ে রেখেছিল—রানী কেবলই কাঁদে—তখন রাজকুমার সেই ডাইনীটাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলে—

বিষ পেল কোথায় রাজকুমার!

কেন রায়বাড়ির বাগানে একটা গাছের পাতার রস, সেই তো বিষ ছিল—আচ্ছা করালীদা—

কি!

তুমি চেন সেই গাছটা ?

কোন গাছটা রে!

ঐ যে যার পাতার রসে ভীষণ বিষ আছে—আমাদের বাগানে অত গাছ আছে—নিশ্চয়ই সে গাছও আছে—আছে না করালীদা—

বোধহয় আছে।

আমি ঠিক খুঁজে বের করব।

ঐ পর্যন্ত বলে করালীচরণ থামে।

সুহাস প্রশ্ন করে, তারপর ?

তারপর কদিন দেখেছি ও বাগানের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

একদিন বললাম—এই দুপুরে বাগানে কি করছেন দাদাবাবু ?

সেই বিষের গাছটা খুঁজছি—দাদাবাবু বলে। তারপর থেকে প্রায়ই আমাকে গাছটার কথা জিজ্ঞাসা করত—গাছটা চিনিয়ে দিতে বলত।

নিশ্চয়ই চেনো তুমি—তুমি কত বড় তুমি জান না হতেই পারে না। বল না কোন্ গাছটা, দেখিয়ে দাও না আমাকে গাছটা—

তারপর ?

তারপর একদিন মনে পড়ে বনতুলসীর একটা গাছ দেখিয়ে বলেছিলাম, ঐ সেই গাছ—

সত্যি !

হ্যাঁ—ছুঁ'কৌটা ওর পাতার রস খেলে নির্ঘাত মারা যাবে সে।

হুঁ—আচ্ছা করালীচরণ—তোমার বাবু একদিন জলসাঘরেই গান গাইতে গাইতে হঠাৎ মারা যান, তাই না—সুহাস আবার প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—কি যে হলো—শরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঢলে পড়লেন—মিনিট দশ-পনেরর মধ্যেই মারা গেলেন—ডাক্তার এলো বললে, হার্টফেল করেছেন হঠাৎ—

তোমার দাদাবাবু তখন কোথায় ছিল ?

সে এক আশ্চর্য ব্যাপার ডাক্তারবাবু—কোথায় ছিল কে জানে—হঠাৎ জলসাঘরে ছুটে এসে বাবুর বুকের উপর আছড়ে পড়ে সে কি কান্না—তারপরই তো অজ্ঞান—আর ধুম জ্বর—

আর বাঈজী !

সে তো সেই রাত্রেই কখন এক ফাঁকে চলে গিয়েছিল—আমরা জানতেও পারিনি।

॥ ২৬ ॥

শেষ পর্যন্ত ডাঃ দে স্থির করেছিলেন অসিতকে তাঁর চেম্বারে নিয়ে যাবেন না, ওদের ঐ বাড়িতে এবং ঐ ঘরেই সিটিং দেবেন।

ঔষধ ইনজেকশন দেবার পর একটা আধো ঘুম—আধো জাগরণ ভাব এসে যায় অসিতের।

সামনে একটা চেয়ারে বসে ডাঃ দে অতঃপর নানা প্রশ্ন করে যান অসিতকে।

অসিত ধীরে ধীরে জবাব দিয়ে যায়।

অনেকক্ষণ পরে এক সময় ডাঃ দে বের হয়ে এলেন ঘর থেকে—সুহাসকে নিয়ে।

মল্লিকা ঘরের দরজার বাইরেই ছিল দাঁড়িয়ে।

দাঁড়ালেন ডাঃ দে, মল্লিকা দেবী!

বলুন?

এখন উনি বোধহয় কিছুক্ষণ ঘুমোবেন। ওকে যেন কোন রকম বিরক্ত না করা হয়।

মল্লিকা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

ভবানী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চান বলায় সুহাস তার ঘরে ভবানী-দেবীকে ডেকে নিয়ে এলো।

আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই ভবানী দেবী!

ডাঃ দে বললেন।

ভবানী দেবী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডাঃ দের মুখের দিকে তাকালেন।

আমার মনে হচ্ছে অসিতবাবুর জীবনে আরো কোন ঘটনা আছে—এবং যে ঘটনার সঙ্গে আপনার স্বামী, অসিতবাবু ও সেই বাঈজী জড়িত ছিল!

তা কি করে হবে—অসিতকে কখনো সেদিকে তো আমি যেতেই দিইনি—মৃদু কণ্ঠে ভবানী দেবী জবাব দিলেন।

না দিলেও অসিতবাবু জানতেন ঐ বাঈজীর কথা।

তা হয়ত জানত—

শুধু জানত নয়—ওর মনের মধ্যে একটা দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে উনিই ওর বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

এ আপনি কি বলছেন—তাঁর তো হঠাৎ হার্টফেল করে মৃত্যু হয়—

হয়ত তাই হয়েছিল, তবু ঐ যা বললাম ওঁর বাপের সে রাত্রের মৃত্যুর জন্য নিজেকেই তিনি দায়ী করেছেন। ওঁর ধারণা—কি জানেন, শুধু ওঁর বাপের মৃত্যু নয়—সে মৃত্যু ঘটেছে—

কি?

ওর হাতের বিষপ্রয়োগে—

না, না—হঠাৎ যেন আর্তগলায় একটা অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন ভবানী দেবী।

শুনুন ভবানী দেবী—আমি জানতে চাই সে রাত্রের ঘটনা সম্পর্কে আরো কিছু আপনি জানেন কিনা ?

আমি—আমি যা জানি সবই তো বলেছি—

বলেছেন কিনা সব আপনিই জানেন—কিন্তু এও জানবেন আপনার ছেলের বর্তমান যে মানসিক অবস্থা এবং দু-দুবার যে তিনি ইতিপূর্বে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তার মূলে কোন সত্য ঘটনা আছে—যে ঘটনা ওর শিশুমনে একদিন প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল—এবং সে আঘাতের কালো দাগটা এতদিনেও ওর অবচেতন মন থেকে মুছে যায় নি। ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে হলে ওর মনের সেই কালো দাগটা আমাদের একেবারে মুছে দিতে হবে।

ভবানী দেবী যেন চুপ—একেবারে পাথর।

আপনি নিশ্চয়ই চান ভবানী দেবী, ডাঃ দে আবার বলতে লাগলেন, আপনার একমাত্র ছেলে যে কেবল সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠুন তাই নয়—ওঁর জীবনের সঙ্গে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক একটি যে নির্দোষ মেয়ের জীবন আপনি চিরদিনের জন্য গেঁথে দিয়েছেন সে মেয়েটির জীবনও সব দিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠুক—ওঁরা দুজনে সুখী হোক—আপনার ছেলে আপনার পুত্রবধূ—ভেবে দেখুন ভবানী দেবী—খুব ভাল করে ভেবে দেখুন এমন কোন ঘটনা আপনি জানেন কিনা—যাতে করে হয়ত ওঁর ধারণা হয়ে গিয়েছে উনিই ওঁর বাপকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছেন—নচেৎ বিষের কথা কেন ওঁর অবচেতন মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে ! ওঁর বাবার মৃত্যুর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক—

ভবানী দেবী নিশ্চুপ।

ডাঃ দে অতঃপর বললেন, আবার আমি আসবো—আপনি ভাবুন—ভেবে দেখুন—

সেদিনকার মতন ডাঃ দে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কলকাতা শহরে আবার আষাঢ় মাস এসে গেল—এখনো বৃষ্টি নামল না।

অসহ্য গ্রীষ্মতাপে যেন সমস্ত শহর ঝলসে যাচ্ছে।

মল্লিকা অসিতকে ছেড়ে সেদিন কোথায়ও যায় নি, একবারের জন্যেও তার ঘর থেকে বের হয়নি।

সন্ধ্যার কিছু পরে অসিতের ঘুম ভেঙ্গেছিল—

মল্লিকা তাকে এক কাপ গরম স্যুপ খাইয়েছিল—তার পর আবার সে ঘুমাচ্ছে।

খোলা জানালাপথে দেখা যায়—আকাশে মেঘ করেছে।

পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ যেন আকাশটাকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। আজ বৃষ্টি নামবেই মনে হয়।

মধ্যে মধ্যে সোনালী বিদ্যুতের ঝলকানি।

মল্লিকা অসিতের শিয়রের সামনে বসে ছিল একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে।

ক্রমশঃ রাত বাড়ে।

ভবানী দেবীর চোখেও সে রাত্রে ঘুম ছিল না।

তিনিও অন্ধকার ঘরে একাকী খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ডাঃ দের কথাগুলোই তাঁর মনের মধ্যে থেকে থেকে যেন আনাগোনা করছিল। ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে হলে ওর মনের সেই কালো দাগটা আমাদের একেবারে মুছে দিতে হবে। ওর জীবনের সঙ্গে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক একটি যে নির্দোষ মেয়ের জীবন আপনি চিরদিনের জন্য গেঁথে দিয়েছেন তার জীবনও সব দিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠুক—ওরা দুজনে সুখী হোক—আপনার ছেলে আপনার পুত্রবধূ—

চম্‌কে ওঠেন হঠাৎ ভবানী দেবী—সেই দরবারী কানাড়ার সুর—সুহাস বেহালা বাজাচ্ছে।

সে রাত্রেও ঐ সুরে গাইছিলেন তাঁর স্বামী—

চোখের উপর যেন বহুদিন আগেকার একটা রাত এক নারীর দু-চোখের পাতায় অতীতের অন্ধকার সরিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

যা কোন দিনও করেন নি তিনি—তাই সেদিন তিনি করেছিলেন।

দিনের পর দিন যে হিংস্র জ্বালাটা তাঁর বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠেছিল—সে জ্বালায় ছটফট্ করতে করতে সেদিন এক হিংস্র বাঘিনীতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি।

পায়ে পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে তিনি নীচে নেমে গিয়েছিলেন।

জলসাঘরের পশ্চাতে এসে দাঁড়ালেন অন্ধকারে বাগানের মধ্যে।

সেও আষাঢ়ের এক রাত। মেঘে মেঘে আকাশটা একেবারে কালো হয়ে গিয়েছিল—বিদ্যুতের চমক ক্ষণে ক্ষণে।

রায়বাড়ির সেই জলসাঘর।

জানালাপথে উঁকি দিয়ে সেই প্রথম তিনি দেখলেন।

বিরাট ঘরটা।

সমস্ত ঝাড়বাতিগুলো জ্বলছে—মোমবাতি।

নীচে মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো—তার উপরে ফরাস পাতা।

সামনে পাত্রে—মদের বোতল ও কাচের গ্লাস।

তানপুরাটা বুকের কাছে ধরে তাঁর স্বামী গান গাইছেন—দরবারী কানাড়া—আর পাতলা সূক্ষ্ম একটা রেশমী শাড়ি পরিহিতা বাঈজী নৃত্য করছে।

গুরু গুরু মেঘের ডাক শোনা গেল।

ঝম্ ঝম্ করে কখন বৃষ্টি নেমেছে জানতেও পারেন নি ভবানী দেবী।

জানালাপথে বৃষ্টির ঝাপটা এসে কখন সর্বাঙ্গ তাঁর বলতে গেলে

ভিজিয়ে দিয়েছে।

ভবানী দেবী ঘর থেকে বের হলেন।

বারান্দাটায় আলো জ্বলছে—কিন্তু জনপ্রাণী নেই।

অসিতের ঘরে আলো জ্বলছে এখনো দেখতে পেলেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন ভবানী দেবী অসিতের ঘরের দরজার দিকে।

খোলা দরজাপথেই নজর পড়লো।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে।

অসিত ঘুমিয়ে।

তার শিয়রের সামনে বসে মল্লিকা—খাটের বাজুতে মাথা দিয়ে সেও বোধ হয় ক্লান্তিতে চোখ বুজেছে।

তৈলহীন রুক্ষ মাথার চুল বুকে পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে।

গায়ের আঁচলটা স্খলিত হয়ে পড়েছে—

হঠাৎ যেন মনে হলো ভবানী দেবীর—মল্লিকা যেন তার স্বামীকে নিয়ে বেহুলার শবসাধনা করছে।

ডাঃ দের কথাগুলো আবার মনের মধ্যে ঝাপটা দিয়ে যায় যেন : আপনি নিশ্চয়ই চান ভবানী দেবী, আপনার একমাত্র ছেলে আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠুক।...দুজনে সুখী হোক—আপনার ছেলে আপনার পুত্রবধূ।...খুব ভাল করে ভেবে দেখুন এমন কোন ঘটনা আপনি জানেন কিনা যাতে ওর ধারণা হয়ে গিয়েছে উনিই ওর বাপকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছেন!...

ভবানী দেবীর মুখের উপর যেন একটা অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দৃঢ় পদে ভবানী দেবী সুহাসের ঘরের দিকে এগিয়ে চলেন এবার।

সুহাসের ঘরের দরজা খোলাই ছিল।

বেহালাটা হাতে নিঃশব্দে চুপচাপ সুহাস জানলার সামনে বাইরের বৃষ্টি ঝরা রাতের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সুহাস!

কে?

চমকে ফিরে তাকাল সুহাস।

মা—আপনি—এত রাত্রে—অসিতবাবু কি—

না, সে ভালই আছে, ঘুমোচ্ছে।

আপনি কাঁপছেন মা বসুন—একটি চেয়ার এগিয়ে দেয় সুহাস কথাটা বলতে বলতে।

কিন্তু ভবানী দেবী বসলেন না।

সুহাস, আজ সব কথা তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করবো বলেই এসেছি—

বসুন মা!

যে কথা কেউ জানে না আজো—কেউ কোন দিন হয়ত জানতেও পারত না—দীর্ঘ এই ষোল বছর যে পাপ যে অন্যায় যে লজ্জা এই বুকের মধ্যে চেপে রেখেছি—আজ সব—সব বলবো—

বলতে বলতে একবার থামলেন ভবানী দেবী।

বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে। এ বৃষ্টি বুঝি থামবে না।

সব কথা, ভবানী দেবী আবার বলতে লাগলেন, সেদিন আমি বলিনি সুহাস। বলতে গিয়েও বলতে পারিনি—নিজের লজ্জা আর কলঙ্কের কথা। ...মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম—সত্যিই মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম সেদিন আমি যেদিন আমারই চোখের উপর এক বেশ্যা—এক নর্তকী—আমার স্বামীকে আমার সন্তানের বাপকে ছিনিয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল দিনের পর দিন। তবু—তবু আমি সেই অসচ্চরিত্র মাতাল স্বামীকে ফেরাবার চেষ্টা করেছি—তার পায়ে ধরে মিনতি করেছি—কিন্তু পরিবর্তে স্বামীর কাছে কি পেয়েছিলাম জান? একটা লাথি!

ধ্বক ধ্বক করে যেন জ্বলছে ভবানী দেবীর চোখের তারা দুটো।

স্বামী তখন আমার বাগানবাড়িতেই রাত্রি দিন পড়ে থাকত। লজ্জা ঘৃণার মাথা খেয়ে করালীকে দিয়ে তাকে পর পর চার-পাঁচ দিন ডে

পাঠাবার পর এক রাত্রে সে এলো আমার ঘরে। আকণ্ঠ মদ্যপান করেছে।

কি চাই! এতবার করালীকে দিয়ে ডেকে পাঠাবার কি এমন দরকারটা পড়লো জানতে পারি কি!

দেখো তোমার কোনো কথাতেই কোন ব্যাপারেই আমি থাকবো নাই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, কিন্তু—

অত্যন্ত শুভবুদ্ধি। তা সে শুভবুদ্ধিটা বদলে গেল কেন!

তুমি যা খুশি করো—শুধু ঐ বেশ্যাটাকে নিয়ে অন্য কোথাও যাও —করজোড়ে তোমায় মিনতি করছি—

মুখ সামলে কথা বলো ভবানী। ওকে আমি বিয়ে করব স্থির করেছি—সেদিন সারা বাড়ি আলো দিয়ে সাজাব—বাজী পোড়াব—

কয়েকটা মুহূর্ত স্বামীর নির্লজ্জতায় যেন বোবা হয়ে থাকেন ভবানী দেবী—তারপর ধীরে ধীরে বলেন, যা খুশি তোমার কর—এ বাড়িতে নয় —দোহাই তোমার—

এটা তোমার বাপের বাড়ি নয়—আমার বাড়ি—এখানে আমার যা খুশি তাই করবো। তোমার এখানে না পোষায় যেখানে খুশি তোমার তুমি চলে যেতে পার!

তাতে করে তোমার ইজ্জত বাড়বে না। তাছাড়া ভুলে যেও না— তোমার সন্তান আছে—সে বালক হলেও চোখের উপর এইসব দেখছে দিনের পর দিন—অন্তত তার কথা—তার ভবিষ্যৎ ভেবেও তুমি—ওকে এখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাও—যেখানে খুশি নিয়ে যাও—ওকে বিয়ে কর যা মন চায় তোমার কর কিন্তু এখানে নয়—এ বাড়িতে নয়—

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠেন কুমুদশঙ্কর।

কিছু হবে না। কোনও ভাবনা নেই তোমার—বড় হলে তো একদিন তার বাপের পথই সে ধরবে। রায়বাড়ির ভাবী কর্তার হাতেখড়ি হয়ে যাচ্ছে মন্দ কি! হাঃ হাঃ—

ওগো না, না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আমার জন্য নয়— তোমার নিজের সন্তানের কথাটা একবার ভাব—

পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন ভবানী দেবী স্বামীর।

নেকামি করতে হবে না, ওঠো—সরো—

না, না—কিছুতেই না—আগে বল—

ভবানী পা ছাড়ো!

না।

খেৎতেরি—বলে বিরক্তিভাবে একটা লাথি দিয়ে ছিটকে ফেলে দিল স্ত্রীকে কুমুদশঙ্কর। তার পর ঘর থেকে চলে গেল।

উঠে দাঁড়ালেন তার পর ভবানী দেবী।

দু'চোখে তখন তাঁর যেন আগুন জ্বলছে। দলিত সর্পিণী!

॥ ২৭ ॥

পরের দিন।

দ্বিপ্রহরে করালীচরণকে ডেকে পাঠালেন ভবানী দেবী। প্রত্যহ রাত্রে করালী সরবৎ তৈরী করে জলসাঘরে পাঠিয়ে দিত।

বাঈজী কখনো মদ্যপান করতো না। সে প্রতি রাত্রে ঐ সরবৎ পান করতো।

করালীকে একটা কাজের ভার দিয়ে সেদিন ভবানী দেবী বাজারে পাঠিয়ে দিলেন।

করালী বলেছিল, সরবৎ কে তৈরী করে দেবে? বাবু যদি সরবৎ না পান—জলসার সময় তুলকালাম করবেন মা—

ভবানী দেবী বলেছিলেন, তুই যা, বদ্যিনাথ সরবৎ দিয়ে আসবে।

সে কি সরবৎ তৈরী করতে পারবে মা, বাঈজীর অনেক বায়নাক্কা—বাদাম বেটে বেটে—পেস্তার সঙ্গে একেবারে মিহি করে—

আমি করে দেবো—তুই যা—

আপনি! আপনি করবেন?

ভবানী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ভবানী দেবী জলসাঘরে বাঈজীর জন্য সরবৎ তৈরী করে পাঠিয়ে দেবে!

তুই যা করালী—ভাবতে হবে না তোকে।

করালী চলে গিয়েছিল। আর প্রতিবাদ করেনি—আর সাহস পায়নি প্রতিবাদ করতে।

বাড়ির পোষা কুকুরটা কয়েক মাস আগে পাগল হয়ে গিয়েছিল। কেবলই চেঁচাত আর সকলকে কামড়াতে যেতো—

তাকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। কুমুদশঙ্করই মেরেছিল কুকুরটাকে নিজের হাতে বিষ দিয়ে।

সেই বিষের শিশিটা ঘরেই ছিল।....

ভবানী দেবী যেন বলতে বলতে থামলেন।

সুহাস ভবানী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে—ঝর-ঝর-ঝর—এলোমেলো হাওয়া। থেকে থেকে অন্ধকার বৃষ্টিঝরা প্রকৃতি যেন বিদ্যুতের সোনালী আলোয় ঝলসে উঠছিল।

ভবানী দেবী বলতে লাগলেন—নিজে হাতে সরবৎ তৈরী করলাম—তারপর সেই কুকুর মারা তীব্র বিষ মিশিয়ে দিলাম সরবতে।

সুহাস চেয়ে আছে ভবানী দেবীর মুখের দিকে।

ভবানী দেবীর চোখের মণি দুটো জ্বলছে। সমস্ত মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

মাথার গুণ্ঠন খসে পড়েছে—

বৈদ্যনাথকে দিয়ে, ভবানী দেবী অদ্ভুত ফিস্ ফিস্ কণ্ঠে যেন বলতে লাগলেন, সেই সরবৎ জলসাঘরে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর জানালাপথে বাগানে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইলাম। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে—সর্বাঙ্গ জলে ভিজে যাচ্ছে। জলসাঘরে গান আর নাচ চলেছে—

বাঈজী কুমুদশঙ্করের কোলে শুয়ে পড়ল। কুমুদশঙ্কর আদর করে বাঈজীকে।

সত্যি তুমি আমায় বিয়ে করবে কুমুদ, বাঈজী শুধায়।

হ্যাঁ—করবো—করবো—

কিন্তু তোমার স্ত্রী—

ওকে ওর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো—

না, না বাপের বাড়িতে নয়, এখানেই সে থাকবে।

কেন বল তো ?

বাঃ থাকবে বৈকি। না হলে মজা কোথায়! জ্বালায় ছটফট্ করবে তবে না। আমি বাঈজী—আমি—বেশ্যা—আমি নর্তকী—

বেশ—তাহলে তাই হবে।

হ্যাঁ—তাই। আমি বেশ্যা—আমি নর্তকী—আমি জবাব দেবো—বলতে বলতে পিপাসার্ত ক্লান্ত বাঈজী সামনে রাখা সরবতের গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে তুলে নেয়।

বাধা দেয় সঙ্গে সঙ্গে কুমুদশঙ্কর, না—আজ সরবৎ নয়—আজ এই অমৃত—নিজের হাতের মদের গ্লাসটা এগিয়ে দেয় বাঈজীর দিকে কুমুদ-শঙ্কর।

না, না—তুমি তো জান ও আমি খাই না—

আমার অনুরোধে একটা রাত না হয় খাও।

কিন্তু—

খাও—খাবে না ?

গলাটা জড়িয়ে ধরে কুমুদশঙ্কর বাঈজীর।

বেশ দাও—কিন্তু একটু—

তাই হবে।

কুমুদশঙ্কর হাতের গ্লাসটা বাঈজীর হাতে তুলে দেয়—সরবতের গ্লাসটা নিজের হাতে নেয়।

কুমুদশঙ্কর বলে, অক্ষয় হয়ে থাক আজকের রাতটা—তুমি আমার গ্লাসের পানীয় পান কর—আমি তোমারটা—

দুজনে হাসতে হাসতে একসঙ্গে গ্লাসে চুমুক দেয়—জানালাপথে চেয়ে আছে এক জোড়া চোখ। অস্ফুট কণ্ঠে ভবানী দেবী যেন চীৎকার করে ওঠেন, না, না, না—

কয়েকটা মুহূর্ত—তার পরই অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট্‌ করতে করতে ফরাসের উপর লুটিয়ে পড়েন কুমুদশঙ্কর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে জলসাঘরের দরজা ঠেলে ছুটে এসে বাপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অসিত।

না, না—বাবা—আমি—আমি তোমাকে বিষ দিতে চাই নি—বাবা—বাবা—

শিথিল হাত দুটো মেলে অসিতকে বুকে টেনে নেয় কুমুদশঙ্কর, খোকন—সোনা—

বাবা—

কুমুদশঙ্করের মাথাটা ঢলে পড়ল পরমুহূর্তেই।

বাবা!

কোথায় বোধহয় একটা বাজ পড়লো। কড়্‌-কড়্‌-কড়াৎ—

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল অসিতের।

সামনেই খাটের বাজুতে মাথা দিয়ে মল্লিকা ক্লান্তিতে কখন চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গায়ের আঁচলটা স্খলিত।

ব্লাউজের সীমানা ভেদ করে উদ্ধত যৌবন যেন টলমল করছে।

নির্নিমেষে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ অসিত সেই অসম্বৃত যৌবন-সম্ভারের দিকে। ভিতরে ভিতরে একটা কামার্ত ভাব—আদিম লিপ্সা এতকাল যা সুপ্ত ছিল এবং গত কিছুদিন ধরে যেটা মধ্যে মধ্যে মল্লিকাকে ঘিরে বুকের মধ্যে অস্থির অস্ফুট এক উন্মাদনা জাগাচ্ছিল সেটা যেন সহসা বাঁধভাঙ্গা একটা বন্যার স্রোতের মত দুকূল ছাপিয়ে বের হয়ে এলো ঐ মুহূর্তে।

দু'হাত বাড়িয়ে অসিত মল্লিকার ঘুমন্ত শিথিল অসম্বৃত দেহটা জাপটে ধরে।

ঘুম ভেঙ্গে যায় আকস্মিক সেই আকর্ষণে মল্লিকার।

প্রথমটা সে বুঝতে পারে না।

তারপরই অসিতের উন্মাদ আলিঙ্গন থেকে সে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

কিন্তু পারবে কেন?

অসিতের সঙ্গে সে পারবে কেন?

মল্লিকার গায়ের ব্লাউজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়—পরিধেয় শাড়িটা খুলে পড়ে—আর ঠিক সেই সময় ওদের ঝটাপটিতে ধাক্কায় মাথার কাছে টেবিলে রাখা টেবিল ল্যাম্পটা মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় ঝন ঝন শব্দ করে।

ঘর অন্ধকার হয়ে যায়।

ছাড়—ছাড়—চেঁচিয়ে ওঠে মল্লিকা।

আলো ভাঙ্গার ঝন্ ঝন্ শব্দ আর মল্লিকার সেই চীৎকার সুহাসের কানে যায়। সে ছুটে আসে ওদের ঘরে।

একি ঘর অন্ধকার কেন—মলি—মলি—কোথায় তুমি!

কোনমতে ততক্ষণে মল্লিকা নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে—আর সুহাস সুইচ্ টিপে ঘরের অন্য আলোটা জ্বালিয়ে দেয়, অন্ধকার ঘরটা আলোয় ঝলমল করে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে তার প্রায়-উলঙ্গ বিপর্যস্ত বেপথুমানা মল্লিকার শরীরটা।

সে ছুটে কোনমতে ঘর থেকে বের হয়ে যায় সুহাসের পাশ কাটিয়ে যেন পাগলের মতই।

সুহাসের নজর পড়ে অতঃপর অসিতের দিকে।

তারও গায়ের জামাকাপড় ছেঁড়া এলোমেলো, মাথার চুল বিপর্যস্ত—আর দুচোখে কি এক অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

কি—কি হয়েছে অসিতবাবু? এগিয়ে যায় সুহাস।

মল্লিকা—

বসুন—বসুন আপনি—আমি মল্লিকাকে ডাকছি—

না—মল্লিকা—মল্লিকা কোথায় গেল—

সুহাসই তখন চেঁচিয়ে ডাকে, মলি—মলি এ ঘরে এসো—মল্লিকা!

মল্লিকা কোন সাড়া দেয় না।

সুহাস আবার ডাকে, মলি, এ ঘরে এসো। মলি?

মল্লিকাকে দরজার উপর দেখা যায়। ইতিমধ্যে শাড়িটা সে বদলেছে—কিন্তু তার চোখে কেমন যেন এক শঙ্কাকুল দৃষ্টি।

এসো মল্লিকা—সুহাস বলে, এস ঘরে এসো।

মল্লিকা ইতস্তত: করে।

এসো!

মল্লিকা অসিতের দিকে চেয়ে আছে কেমন যেন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে। মল্লিকা সুহাসের দিকে তাকায়।

মল্লিকা আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে ঔষধের টেবিলের কাছে চলে গিয়ে শিশি থেকে ঘুমের ঔষধটা সুহাসেরই চোখের ইঙ্গিতে একটা কাচের গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে এসে সুহাসের হাতে তুলে দেয়।

সুহাস ঔষধের গ্লাসটা নিয়ে গিয়ে অসিতের সামনে দাঁড়াতেই অসিত যেন সহসা ক্ষেপে ওঠে।

এক থাবা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুহাসের হাত থেকে গ্লাসটা ছিটকে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, চালাকি! বিষ—বিষ দিতে চাও?

না, না—এ বিষ নয়—সুহাস বলে, এটা ঔষধ—

বিষ—বিষ—চেঁচিয়ে ওঠে আবার অসিত যেন পাগলের মতই।

না, বিষ না। আপনার ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে আপনার হাতের দেওয়া বিষ সরবতের সঙ্গে পান করেই আপনার বাবার মৃত্যু হয়েছিল একদিন—

বাবা ?

হ্যাঁ, আপনার বাবা।

আমি !

হ্যাঁ, আপনার অবচেতন মনের ঐ ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে আছে বলে নিজের অজ্ঞাতে আপনি বিশেষ স্বপ্ন দেখেন—আর আপনি জানেন না কোন সুন্দরী সুবেশা তরুণীকে দেখলেই মন আপনার বিতৃষ্ণায় তিক্ত হয়ে ওঠে কেন ; আপনাদের বাড়িতে এক সুন্দরী বাঈজী এসেছিল—আপনি যখন খুব ছোট ছিলেন—

বাঈজী !

হ্যাঁ—আপনি হয়ত ভুলে গিয়েছেন—আপনাদের বাগানবাড়িতে সেই বাঈজী থাকত—সেই বাঈজীকে নিয়ে আপনার বাবা সর্বক্ষণ মত্ত থাকতেন, ঘরে আসতেন না।

বাবা ?

হ্যাঁ—আপনার বাবা। বাবা ঘরে আসতেন না বলে আপনার মা কাঁদতেন—

মা—

হ্যাঁ—মাকে আপনি অত্যন্ত ভালবাসতেন—তাই মায়ের দুঃখ দেখে আপনিই চেয়েছিলেন সেই বাঈজীকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলতে—

বিষ !

হ্যাঁ—বিষ। সে রাত্রে তাই আপনি বাঈজীর সরবতের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—দিয়েছিলাম। একটা গাছের পাতার রস। মা সরবৎ তৈরী করে রেখে চলে যাবার পর চুপি চুপি ঘরে ঢুকে সেই পাতার রস আমি সরবতের গ্লাসে মিশিয়ে দিয়েছিলাম—বিষ—তীব্র বিষ—যা খেলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মারা যায়—

কিন্তু সেটা বিষ নয়। সে গাছের পাতার রসে বিষ আদৌ নেই।

নেই—বিষ ছিল না?

না।

তবে—তবে বাবা—

বাবা আপনার মারা গিয়েছিলেন—একটু থেমে বলে সুহাস, হার্টফেল করে হঠাৎ—

হার্টফেল করে মারা যান বাবা? আমার বাবা—

হ্যাঁ—পরে ডাক্তাররা এসে দেখে পরীক্ষা করে আপনার বাবাকে তাই বলেছিল। আপনি আপনার বাবাকে হত্যা করেন নি। তিনি হার্টফেল করে মারা যান। কোন বিষে তার মৃত্যু হয়নি।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল ইতিমধ্যে।

ভাঙ্গা মেঘের ফাঁকে একফালি চাঁদও উঁকি দিচ্ছিল।

মা—মা কোথায়—আমার মা—মা—মামণি—

অসিত হঠাৎ ঘর থেকে বের হয়ে যায় মা বলে ডাকতে ডাকতে, মা—মা—মামণি—

অসিত ভবানী দেবীর ঘরে এসে ঢুকল ছুটতে ছুটতে।

কিন্তু ঘর খালি। ভবানী দেবী ঘরে নেই।

মা—কোথায় তুমি—মামণি—

এঘর থেকে ওঘর—পুজোর ঘর উপরের সব ঘর একে একে ঘুরে আসে অসিত ভবানী দেবীর সন্ধানে, কিন্তু ভবানী দেবী কোথায়ও নেই।

মায়া, সুহাস ও মল্লিকাও ভবানী দেবীকে সর্বত্র খুঁজতে থাকে।

কিন্তু ভবানী দেবী নেই।

অসিত ডাকে, মা—

মল্লিকাও ডাকে, মা—

হঠাৎ সুহাসের কি মনে হয়—সে ছুটে যায় ভবানী দেবীর শয়ন ঘরে।

ঘরের দেওয়ালে ভবানী দেবীর মন্ত্রগুরুর যে এনলার্জ ফটোটা ছিল

—তারই নীচে জলচৌকির উপরে সোনার কাজললতা দিয়ে চাপা দেওয়া একটা ভাঁজ করা কাগজ পাওয়া যায়।

ক্ষিপ্র হাতে সুহাস চিঠির ভাঁজটা খুলে ফেলে।

একটা চিঠি।

তারই নামে চিঠিটা লেখা—ভবানী দেবীর চিঠি।

কল্যাণীয়েষু সুহাস,

যে কলঙ্ক—যে লজ্জা—যে পাপ এতকাল চোরের মত বুকের মধ্যে গোপন করে রেখেছিলাম—যার বৃশ্চিক দংশন প্রতি মুহূর্তে এই ষোল বছর ধরে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে—সে কথা আজ তোমার কাছে অকপটে এতদিন পরে স্বীকার করে বিশ্বাস করো সত্যিই বুঝি মুক্তিস্নান হলো আমার।

জীবনে সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যা বলিনি।

সদাচারী ঋষিকল্প বাপের সন্তান আমি। তারই শিক্ষায় মিথ্যাকে চিরকাল ঘৃণা করে এসেছি।

তাই আজ সত্য প্রকাশ হয়ে যাবার পর আর যার সামনেই দাঁড়াই না কেন আমার খোকন—আমার সন্তানের সামনে তো দাঁড়াতে পারব না!

তুমি সে রাত্রে বলেছিলে সত্য জানতে পারলে আমার খোকন আবার সুস্থ—স্বাভাবিক হয়ে উঠবে—এবারে সে সত্যিই উঠবে তো?

ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই তাই যেন হয়। তাই যেন হয়।

এ চিঠি আমার ছেলে আমার বৌমাকে তুমি দেখিও—তারা যেন সত্যটা জানতে পারে।

অসিতকে বলো, তার মা-ই একদিন তার বাপকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছিল।

তাদের জীবন থেকে আমি সরে গেলাম।

রায়বাড়ির সমস্ত কলঙ্ক—লজ্জা—দুঃখ—অপমান—অমঙ্গল যা কিছু সব আমি নিয়ে গেলাম। সোনার কাজললতাটা আমার বৌমাকে দিও। বলো আমি দিয়েছি।

তোমার ঋণ তো সুহাস এ জীবনে শোধ করতে পারব না বাবা। ভগবানের কাছে কেবল প্রার্থনা জানাই তুমি সুখী হও।

আশীর্বাদিকা
ভবানী দেবী

সুহাসের চিঠি পড়া তখনো শেষ হয় নি—অসিত ও মল্লিকা এসে ঘরে ঢুকল।

সুহাস—মাকে তো কোথায়ও পেলাম না, মল্লিকা বলে।

সুহাস মল্লিকার দিকে তাকাল—অসিতের দিকে তাকাল।

মা চলে গেছেন মল্লিকা—

মা চলে গেছেন! কোথায়? অসিতই এবারে প্রশ্ন করে সুহাসকে।

এই যে—তারপর মল্লিকার দিকে তাকিয়ে সোনার কাজললতাটা দেখিয়ে বলে, এটা তোমার মলি—

সুহাস চিঠিটা অসিতের দিকে এগিয়ে দেয় আর কাজললতাটা মল্লিকার দিকে।

মল্লিকা কাজললতাটা হাতে নেয়—ওটা সে শাশুড়ীকে একদিন এ বাড়িতে এসে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

কি এটা! অসিত জিজ্ঞাসা করে, চিঠিটা হাতে নিয়ে।

মার চিঠি—তোমার মার লেখা চিঠি—

মার চিঠি—অসিত বলতে বলতে চিঠিটা হাতে নেয়।

অসিত চিঠিটা পড়তে শুরু করে।

মল্লিকাও অসিতের পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করে।

কল্যাণীয়েষু সুহাস······

গেট দিয়ে সুহাসের গাড়িটা ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল—হেড্‌ লাইট জ্বালিয়ে ঝড়ের বেগে।

বর্ষণসিক্ত রাস্তা বৃষ্টির জলে তখনো চিক্‌ চিক করছে।

হেড্‌ লাইটের আলো সেই জলে পড়ে চিক্‌ চিক্‌ করছে।

রাত্রি ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছিল।

সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে একটা আলোছায়ার স্বপ্নমাধুরী যেন।

নির্জন পথ।

ভবানী দেবী হেঁটে চলেছেন।

রায়বাড়িতে এসেছিলেন একদিন বধূবেশে ঘোমটা দিয়ে সালঙ্কারা, আলোয় আলোয় রায়বাড়ি সেদিন যেন হাসছে।

সানাই বাজছে।

দুধেআলতা পায়ে নববধূ রায়বাড়ির অঙ্গনে পা ফেলেছিলেন। কপালে ও সিঁথিতে ডগডগে সিন্দুর।

বিবাহের রাত্রে বাসরঘরে স্বামী সোনার কাজললতা দিয়ে তাঁর সিঁথিতে এঁকে দিয়েছিলেন সিন্দুর-চিহ্ন।

সে সিন্দুর—সে সোনার কাজললতাকে ভবানী দেবী রায়বাড়ির বধূর হাতেই তুলে দিয়ে এসেছেন।

রায়বাড়ির বধূর সিঁথির সিন্দুর চিরন্তন হোক।

রায়বাড়ির সোনার কাজললতা অক্ষয় হোক।

রিক্ত নিঃস্ব ভবানী দেবী পথের প্রান্তে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যান ক্রমশঃ দূরে দূরে—অস্পষ্ট আবছা হয়ে।

সমস্ত আকাশটা ভোরের সূর্যের আবির্ভাবে তখন যেন রক্তরাঙা হয়ে উঠেছে।

॥ শেষ ॥